Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আহলে কুরআন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসাঃ আয়শা বেগম

রোলঃ 216020785

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আহলে কুরআন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসাঃ আয়শা বেগম

রোলঃ 216020785

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “আহলে কুরআন” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসাঃ আয়শা বেগম, আইডিঃ 216020785 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

.

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আহলে কুরআন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

মোসাঃ আয়শা বেগম

আইডিঃ 216020785

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা 5

আহলে কুরআন এর পরিচয় : 5

আহলে কুরআনের উৎপত্তি : 7

আহলে কুরআন সম্পর্কে বিধান: 9

আহলে কুরআনদের দাবী- দাওয়া: 9

কারা এই কুরআনওয়ালা, যারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠজন? 12

আহলে কুরআনের ফেতনা 25

কুরআন হেফাযতের মর্ম 28

রাসূলের শিক্ষাদানের পদ্ধতি 31

সালাত বিষয়ে আহলে কুরআনের বিকৃতি 39

দ্বীনী বিষয়ে প্রশ্ন করার নিয়ম 44

আহলে কুরআনদের বিভ্রান্তি ও তা নিরসনের উপায় 51

আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আহলে কুরআনদের অবস্থান 52

আহলে কুরআন বা হাদীছ অস্বীকারকারীদের বিধান 54

আল-কুরআনুল কারীমকে আমরা যেমন আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করি, অনুরূপভাবে হাদীছের ক্ষেত্রে আমাদের আক্বীদা কেমন হতে হবে? 56

উপসংহার 67

তথ্যসূত্র : 68

ভূমিকা

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এই ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটে। যারা হাদিস অস্বীকার করতে শুরু করে এবং শুধু কুরআন মানার কথা বলে বেড়ায়। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিসর, ইরাক ও ভারতবর্ষে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভারতে আহলে কুরআনের আবির্ভাব ঘটে ১৯০২ সালে আব্দুল্লাহ চড়কলাবির হাত ধরে। তার সহযোগী ছিল মুহিবুল হক আজিম আবাদি। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও এই ফিতনা পরিকল্পিত হচ্ছে। আলেম সমাজের দায়িত্ব হলো সাধারণ মানুষের সামনে তাদের আসল পরিচয় তুলে ধরা এবং সতর্ক করা। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

আহলে কুরআন এর পরিচয় :

কুরআনবাদী বা আহলে কুরআন হলো ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যারা শুধুমাত্র কুরআনকে ইসলাম ধর্মের বিধান ও আইন হিসাবে মানে ও বিশ্বাস করে। তারা অবশ্য কুরআন ওনলি বলেও নিজেদের পরিচয় দেয়। তারা হাদিস, ইজমা ইত্যাদিকে ইসলামের বিধান ও আইন হিসাবে মানে না। তাদের যুক্তি হল, কুরআন হলো পুর্নাঙ্গ ও সুবিস্তারিত গ্রন্থ; তাই কুরআনের কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই এবং তাদের মতে, ইসলামের নবী কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করতেন না। তাই কুরআন অনুসরণ করলেই তাকে অনুসরণ করা হয়ে যায়। মূলধারার সকল ইসলামপন্থীদের মতে, এই মতবাদটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ এবং এতে বিশ্বাস করা ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

প্রধানত সুন্নীরা কুরআনবাদীদের সমালোচনা করে থাকে। তাদের বিপক্ষে সুন্নী মুসলিমরা একটি হাদীস উল্লেখ করে যেখানে বলা হয়েছে,রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অচিরেই কোনো ব্যক্তি তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার সামনে আমার হাদীস থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে

মহামহিম আল্লাহ্-র কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাব তাকেই হালাল মানবো এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানবো। (নবী বলেন) সাবধান! নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ। সুত্র:উইকিপিডিয়া

যারা কুরআন মুখস্থ করে ও অর্থ অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে তারাই মূলত আহলে কুরআন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কতক লোক আহলে কুরআন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকারীগণ আহলে কুরআন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা’ (ইবনু মাজাহ হা/২১৫; ছহীহুল জামে‘ হা/২১৬৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৩২)। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় মানাভী বলেন, ‘অর্থাৎ কুরআনের হাফেযগণ এবং তদনুযায়ী আমলকারী আল্লাহর ওলীগণ’ (ফায়যুল কাদীর হা/২৭৬৮, ৩/৬৭)।

কিন্তু বর্তমান যুগে হাদীছ অস্বীকারকারী ভ্রান্ত ফেরকার লোকেরা নিজেদেরকে ‘আহলে কুরআন’ বলে দাবী করে। অথচ কুরআনের অসংখ্য আয়াতে হাদীছ তথা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ রয়েছে। যা তারা মানেনা। বস্ততঃ রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বাস্তব চিত্র হ’ল ভ্রান্ত ফেরকা আহলে কুরআন।

রাসূল (ছাঃ) উক্ত দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, ‘জেনে রাখো আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং তার সাথে অনুরূপ একটি বস্তু দেয়া হয়েছে। অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন কোন পেটপুরে খাদ্য গ্রহণকারী (প্রাচুর্যবান) ব্যক্তি তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ কর, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল আর তাতে যা হারাম পাবে তা হারাম মনে কর’ (আবুদাঊদ হা/৪৬০৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬২)। অন্য হাদীছে এসেছে, ‘আমি যেন তোমাদের মধ্যে কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং তার নিকট যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয়

অথবা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন কিছু (হাদীছ) উত্থাপিত হবে তখন সে বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে আমরা যা পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব' (আবুদাঊদ হা/৪৬০৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬৩)।

আহলে কুরআনের উৎপত্তি :

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে বাস্তবে দেখা দেয়। এ সময় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে, যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করে। ইমাম শাফেঈ এমন একজন হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তির সাথে তার মুনাযারার কথা উল্লেখ করেছেন (কিতাবুল উম্ম ৭/২৮৭-২৯২)। সেখানে তিনি তার দাবীর অসারতা প্রমাণ করেছেন। অতঃপর দীর্ঘ এগারো শত বছর হাদীছ অস্বীকারকারীদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ মিলেনি। বিগত শতাব্দী তথা ত্রয়োদশ হিজরীতে এই ফিৎনার পুনরাবির্ভাব ঘটে মিসর, ইরাক এবং ভারতে (বিস্তারিত দ্রঃ 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই)। ভারতে আহলে কুরআনের আবির্ভাব ঘটে **১৯০২** সালে আব্দুল্লাহ চড়কলাবির হাত ধরে। তার সহযোগী ছিল মুহিবুল হক আজিম আবাদি। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও এই ফিতনা পরিকল্পিত হচ্ছে। আলেম সমাজের দায়িত্ব হলো সাধারণ মানুষের সামনে তাদের আসল পরিচয় তুলে ধরা এবং সতর্ক করা। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, 'তারা কাফের এবং ইসলাম হ'তে খারিজ। তাদের হাশর হবে ইহূদী নাছারা বা অন্যান্য ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সাথে' (মিফতাহুল জান্নাহ পৃঃ ৫) (মাসিক আত-তাহরিক)

চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের শিকার আজ মুসলিম উম্মাহ। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে চলছে গণহারে মুসলিম নিধন। একই কাতারে সারিবদ্ধ বাতিল পরাশক্তি। উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে পথভ্রষ্ট এক ফিতনাবাজ দল মুসলমানদের ঈমান হরণে লিপ্ত। কুরআন মানার কথা বলে মানুষকে সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের আহলে কুরআন বলে পরিচয় দিলেও বাস্তবে এরা

মুনকিরিনে হাদিস। সুন্দর নামের আড়ালে লুকিয়ে আছে হীন উদ্দেশ্য। হাদিসের ভাষায় আহলে কুরআনের পরিচয়। হজরত আনাস বিন মালিক রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেছেন, 'কতক লোক আল্লাহর পরিজন'। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেন, 'কুরআন তিলাওয়াতকারীরা আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা। (ইবনে মাজাহ-২১৫) যারা হাদিস মানে না তারা মূলত কুরআনই মানে না। আর যারা কুরআন মানে না তারা আহলে কুরআন হয় কী করে?

আহলে কুরআনওয়ালারা সরাসরি হাদিস মানে না। অথচ কুরআনের একাধিক আয়াতে হাদিস মেনে চলা ও নবীজী সা:-এর আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহি, যা তার কাছে পাঠানো হয়।' (সূরা আন-নাজম : ৩-৪) অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ফিকির করে।' (সূরা নাহল-৪৪) ওই আয়াতে নবী সা:-এর কাজ হলো মানুষকে কুরআন বুঝিয়ে দেয়া। আর নবী সা:-এর মুখনিঃসৃত বাণীই হচ্ছে হাদিস। যারা হাদিস মানে না তারা মূলত কুরআনই মানে না।

বস্তুত এসব ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব প্রিয় নবী সা:-এর ভবিষ্যদ্বাণীরই সত্যায়ন। হাদিসের পাতায় যা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ। হজরত মিকদাম বিন মাদিকারিব আল কিনদি রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেন, 'অচিরেই কোনো ব্যক্তি তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার সামনে আমার হাদিস থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মানব এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানব। মহানবী বলেন, সাবধান! নিশ্চয়ই রাসূল সা: যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ।' (ইবনে মাজাহ-১২)

আহলে কুরআন সম্পর্কে বিধান:

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, হাদিস অস্বীকারকারীদের ধ্বংস অনিবার্য। (শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি, খণ্ড-তৃতীয়, পৃষ্ঠা-৪৭৮) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যারা মনে করে যে, রাসূল সা:-এর আনুগত্য করা অপরিহার্য নয়, তারা কাফির। তাদের হত্যা করা অপরিহার্য।' (আলওয়াসিয়াতুল কুবরা লি ইবনে তাইমিয়াহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৫)

আহলে কুরআনদের দাবী- দাওয়া:

বাতিলের একটা মৌলিক নিয়ম হলো, তারা কখনো অপরিচিত ব্যানার ব্যবহার করে না। তারা তাদের সামনে এমন শব্দ রাখে, যেটা সবাই জানে। শুনলে পরিচিত এবং পবিত্র মনে হয়। আর এই পরিচিত ও পবিত্র শব্দে ভর করেই তারা তাদের গোমহারি ছড়াতে থাকে। 'আহলে কুরআন' এই পবিত্রতম শব্দ ব্যবহার করে উম্মাহর মাঝে 'ইনকারে হাদিস' তথা হাদিস অস্বীকারের ফেতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয় হিজরি শতকের শেষের দিকে পৃথিবীতে প্রথম তাদের সন্ধান পাওয়া যায়।

তখন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে, যারা সুন্নাহকে অস্বীকার করত। হাদিস মানত না। ইমাম শাফেঈ রহ: এমন একজন হাদিস অস্বীকারকারীর সাথে মুনাযারা করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে তার কিতাবুল উম্ম-এ সেটি উল্লেখ করেছেন। (কিতাবুল উম্ম, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮৭-২৯২) সেখানে তিনি তাদের দাবিগুলো খণ্ডন করেছেন, দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন। এরপর দীর্ঘ এগারো শত বছর হাদিস বা সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বিগত শতাব্দীতে পুনরায় এই ফেতনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রথম মিসরে, সেখান থেকে ইরাক এবং ভারতে। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশেও এই ভ্রষ্ট আকিদার কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব লক্ষ

করা যাচ্ছে। এই হাদিস ও সুন্নাহ অস্বীকারকারী ব্যক্তিরাই হলো আহলে কুরআন। নিজেদের পরিচয় তারা এই পবিত্র শব্দ দ্বারা দিয়ে থাকে।

আহলে কুরআনদের স্লোগান হলো- 'রাসূলের হাদিস, সুন্নাত, সিরাত নয়; মানব শুধু আল কুরআন।' তারা কেনো হাদিস, সুন্নাত বা সিরাত মানবে না, এর পেছনে যেসব যুক্তি দিয়ে থাকে, তা স্পষ্ট না, মজবুতও না। ধোঁয়াশায় ঢাকা, ঘোলাটেপূর্ণ। তাদের বক্তব্য হলো- রাসূলের দায়িত্ব ছিল পৌঁছে দেয়া, তিনি পৌঁছে দিয়েছেন; সুতরাং তাঁর দায়িত্ব শেষ। রাসূলকে মানার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু কুরআনই মানতে হবে। কুরআনের ওপরেই আমল করতে হবে। তারা রাসূল সা:কে একজন বার্তাবাহক বা ডাকপিয়নের মতো মনে করে (নাউজুবিল্লাহ)। সাহাবায়ে কেরাম তো তাদের কাছে কিছুই না। 'আমরা এখন কুরআন পেয়েছি, সুতরাং কুরআনই আমরা আমল করব, আমরা নিজেরাই এটা বুঝব। আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট।' তাদের বক্তব্যের সারাংশ এমনই। অথচ তারা এটা বুঝতে চায় না, যে কুরআন তারা মানতে চায়, সেই কুরআনেরই অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা নবীজী সা:কে মানতে নির্দেশ করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করতে বলেছেন, রাসূল সা:কে কুরআনের ব্যাখ্যা করতে বলেছেন। সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করতে বলেছেন।

হাদিস না মানার পেছনে তাদের যুক্তি হলো- হাদিসের বিভিন্ন প্রকার আছে। জাল, সহিহ, হাসান, জইফ ইত্যাদি। হাদিসের মধ্যে সহিহ ও গায়রে সহিহ আছে। যে হাদিস বিভিন্ন প্রকার, সহিহ গায়রে সহিহ মিশ্রিত; সেটি কেন মানব? কত হাস্যকর এবং দুর্বল তাদের যুক্তি। এটা খণ্ডন করতে আমরা এখানে তথ্যবহুল কিছু আনতে চাচ্ছি না, তবে শুধু এতটুকু বলব- এই উম্মাহর জানবাজ মুহাদ্দিসরা যুগে যুগে শুধু হাদিস তথা নবীজীর কথা, কাজ ও সম্মতিগুলো

হেফাজত করেছেন এমন নয়; বরং এগুলো সঠিকভাবে হেফাজত করার জন্য যে বর্ণনাকারীরা এগুলো

বর্ণনা করেছেন, তাদের জীবনী পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে হেফাজত করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। তাঁদের নাম, বাবা ও দাদার নাম; তাঁরা কোথায় কবে জন্মগ্রহণ করেছেন, কোথায় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, ব্যক্তিজীবনে তাঁরা কেমন ছিলেন; সবকিছু সংরক্ষিত আছে।

নবীজী সা: চলে গেছেন চৌদ্দ শত বছরের বেশি হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত উম্মাহর কাছে নবীজীর প্রতিটি কথা সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। প্রতিজন রাবির জীবনী সংরক্ষিত আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। সেই নবীর হাদিস অস্বীকার এত খোঁড়া যুক্তি দিয়ে কোনোভাবেই করা যায় না, এমনকি ময়দানে টিকে থাকা যায় না সামান্য সময়ও; সেটি তারা কেনো বুঝেন না, আমরা তো সেটিই বুঝি না।

''নব্য আহলে কুরআনের' মূল অপরাধ রাসূল অবমাননা''

'আহলুল কুরআন' মূলত একটি মর্যাদাপূর্ণ দ্বীনী পরিভাষা। 'নব্য আহলে কুরআনেরা' এটিকে নিজেদের জন্য অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে। আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إن لله أهلينَ من الناس.

'নিশ্চয়ই মানুষদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর'আহল' (অর্থাৎ আল্লাহর বিশেষ ব্যক্তি)।'

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন-

يا رسول الله من هم؟

'হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?'

আল্লাহর রাসূল বললেন-

هم أهل القرآن، أهل الله وخاصّته

‘তারা আহলুল কুরআন-কুরআনওয়ালা। তারাই আল্লাহর ‘আহল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজন।’ - মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২২৭৯; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৭৯৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৫

কারা এই কুরআনওয়ালা, যারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠজন?

উত্তর স্পষ্ট, সবচে বড় কুরআনওয়ালা হলেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর উপর আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআনের ব্যাখ্যা ও তাফসীর শিখিয়েছেন। তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন- তিনি যেন মানুষকে কুরআনের তিলাওয়াত শেখান, কুরআনের অর্থ-মর্ম ও বিধি-বিধান শেখান, তাদের সামনে কুরআনী জীবনের বাস্তব নমুনা পেশ করেন, কুরআনে নির্দেশিত ইবাদতসমূহের পদ্ধতি ও পরিপূর্ণ রূপরেখা শেখান এবং তাদেরকে কুরআনী শরীয়ত (যা নবীজীর সুন্নতও বটে) শিক্ষা দেন।

এরপর মানুষের উপর ফরয করেছেন- এই সকল বিষয়ে তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে, তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে। সঙ্গে কুরআনে এই সাক্ষ্যও দিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কুরআন এবং তাতে নির্দেশিত সিরাতে মুসতাকীমেরই পথ দেখান। কুরআনী নূরের মাধ্যমেই তিনি মানুষকে ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে হেদায়েত ও ইলমের আলোর দিকে নিয়ে যান।

অতএব খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বপ্রথম ও সবচে বড় ‘আহলুল কুরআন’ বা কুরআনওয়ালা। দ্বিতীয় পর্যায়ের আহলুল কুরআন হলেন সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের সর্বপ্রথম তালিবে

ইলম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর উপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে মানদণ্ড বানিয়েছেন। যেমন কুরআনের প্রতি ঈমান, কুরআনের 'পাঠ' ও তার তিলাওয়াত, কুরআন অনুধাবন, কুরআনের ব্যাখ্যা, কুরআন অনুযায়ী আমল ইত্যাদি। আর এই মহান আমানতের প্রথম বহনকারী ও প্রথম সাক্ষ্যদানকারী বানিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে। পরবর্তীদেরকে কুরআন হাসিলের ক্ষেত্রে তাঁদের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও শিক্ষা ছেড়ে কুরআনের প্রতি ঈমান আনাই অসম্ভব।

আর সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুরআনী যিন্দেগীর উপর রেখে গিয়েছেন সেটাই 'সাবীলুল মুমিনীন'-মুমিনদের পথ। মুমিনদের পথ থেকে বিমুখ হওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট এমন অপরাধ, যেমন অপরাধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা। এই দুই অপরাধের একই শাস্তি আর সেটা হল জাহান্নাম।

'আহলে কুরআন' নামধারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে -নাউযুবিল্লাহ- ডাকপিয়নের মত মনে করে। ডাকপিয়ন পত্র পৌঁছে দিলেই তার কাজ শেষ। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহর কাজটিও যেন এমনই। অর্থাৎ রাসূলের দায়িত্ব ছিল কেবল কুরআন পৌঁছে দেওয়া। তিনি পৌঁছে দিয়েছেন; ব্যস, তাঁর কাজ শেষ। এখন কুরআন বোঝা, তদনুযায়ী কুরআনী ও ঈমানী জীবনের রূপরেখা তৈরি করা, তা থেকে আল্লাহর নির্দেশনাবলি ও বিধানাবলি উদ্ঘাটন করা, তাতে ফরযকৃত ইবাদতসমূহ আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করা- এই সব কাজ আমাদের!! নাউযুবিল্লাহ।

অতএব নব্য আহলে কুরআনের পরিচয় হল, তারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহর চাইতে অধিক কুরআন অনুধাবনকারী ও অনুসরণকারী এবং কুরআনওয়ালা মনে করে। শুধু এটুকু নয়; তারা যেন এটাও বলতে চায় যে, 'কেবল আমরাই কুরআন বুঝি এবং কুরআন মানি।' সেজন্য

তাদের শ্লোগান হল, ‘রাসূলের হাদীস, সুন্নত, সীরাত নয়; মানব শুধু কুরআন’। স্পষ্ট, এটা রাসূলের প্রতি চরম অবমননা।

এ ধরনের অবমাননার অর্থ হল, তাদের না আছে রাসূলের প্রতি ঈমান ও নির্ভরতা, না আছে কুরআনের প্রতি ঈমান। এর অনিবার্য ফল হল, আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের কুরআন মানাই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কুরআনের প্রতি ঈমান ও কুরআন অনুযায়ী আমলের যে পন্থা ও মাপকাঠি আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেটার প্রতি তাদের আস্থা নেই। তাদের আস্থা কেবল নিজেদের বুঝ ও পছন্দের প্রতি।

এই নব্য আহলে কুরআনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, মুসলিম উম্মাহর প্রথম শতাব্দীতে যে মুনাফিকরা ছিল, তারা কখনো কখনো প্রশ্ন ওঠাত, এই হাদীস কুরআনের কোথায় আছে? যাদের ঈমান ও ইলম তখনো পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি, হয়ত তাদের কেউ কেউ সে প্রশ্ন কোনো সাহাবী বা কোনো তাবেয়ীর সামনে রাখত। তখন তাঁরা তাদের সংশয় কীভাবে দূর করতেন সেটাও ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। কোনো সুযোগে তা পাঠকবর্গের সামনে পেশ করব- ইনশাআল্লাহ।

আমরা কম মানুষই হয়ত জানি, নব্য আহলে কুরআনের এসব কুফরী চিন্তা-ধারার প্রচার-প্রসার এখন আমাদের দেশে, এমনকি আমাদের রাজধানীতেই চলছে। প্রয়োজন সতর্কতা ও বিচক্ষণতা। মুমিনের জন্য ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদ হেফাযত করা ফরয। সর্তক থাকতে হবে, কখন কে এই সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চলে আসে।

এই প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতার ভিত্তিতেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি প্রস্তুত হয়েছে। অধমের কথাগুলোকে প্রবন্ধের রূপ দিয়েছেন মওলবী মাহমূদ বিন ইমরান। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং তার এই মেহনতকে কবুল করুন। আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং এ থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন।

(মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দামাত বারকাতুহু)

ঈমান ও ইসলাম আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিআমত। আমরা তাঁর শোকর আদায় করি, তিনি আমাদের মুমিন ও মুসলিম বানিয়েছেন। হেদায়েত ও পথনির্দেশনার জন্য দান করেছেন কুরআনে কারীম। এটি নাযিল করেছেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। তিনি বলেন-

و ۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

(হে নবী!) আমি আপনার প্রতি 'আযযিকর' নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

'আযযিকর' কুরআনে কারীমের একটি নাম। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যেন আপনি তা মানুষকে খুলে খুলে বুঝিয়ে দেন। আর তারাও যেন চিন্তা-ভাবনা করে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বুঝিয়ে দেবেন, সে আলোকেই তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। এতে কুরআনের শিক্ষাগুলো তাদের অন্তরে স্থির হয়ে যাবে এবং আমলে এসে যাবে। লক্ষণীয় হল, আল্লাহ তাআলা কুরআন অবতীর্ণ করে তার বয়ান ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। অর্থাৎ কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবেন আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মুমিন হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত রাসূলের প্রতি ঈমান

মুমিন হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা।

কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনে, সে মুমিন নয়। তাই আল্লাহর প্রতি যেমন ঈমান আনতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

প্রতিও ঈমান আনতে হবে। সেইসঙ্গে আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতিও ঈমান আনতে হবে। কুরআন মাজীদে তিনি বলেন-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে ঈমান এনেছেন, যা তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তারা সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং

তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না (যে, কারো প্রতি ঈমান আনব আর কারো প্রতি ঈমান আনব না।) -সূরা বাকারা (২) : ২৮৫

এ আয়াতে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান, কিতাবের প্রতি ঈমান, ফিরিশতা ও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান- এগুলোর কী অর্থ সেটা আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, কুরআনে কারীমের প্রতি ঈমান আনার কী অর্থ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার কী অর্থ?

রাসূলের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল-

এক. বিশ্বাস করা, তিনি আল্লাহর নবী ও রাসূল। এই সাক্ষ্য দেয়া-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

দুই. এই বিশ্বাস রাখা, তিনি সর্বশেষ নবী। খাতামুন নাবিয়্যীন। তাঁর পরে আর কেউ নবী হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا.

মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। -সূরা আহযাব (৩৩) : ৪০

স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَنَا خَاتَمُ النّبِيِّينَ، لَا نَبِيّ بَعْدِي.

আমি সর্বশেষ নবী। আমার পর কোনো নবী নেই। (অর্থাৎ আমার পরে নতুন করে কেউ নবী হবে না।) -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৫৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৮৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫২; জামে তিরমিযী, হাদীস ২২১৯

قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

সুতরাং রাসূলুল্লাহর পর কেউ যদি নিজেকে নবী দাবি করে, সে মিথ্যাবাদী এবং কাফের। তেমনিভাবে যারা এই মিথ্যানবীকে নবী বা মুজাদ্দিদ, মাহদী বা মাসীহ কিংবা তার অনুরূপ, অথবা ঈমানদার নেককার মনে করবে তারা সবাই কাফের। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী দাবি করেছিল। তাকে অনেকে গ্রহণও করে নিয়েছে। এরা সবাই কাফের।

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কেউ নবী বা রাসূল হবে না। কাজেই তাঁর পরে কেউ যদি নিজেকে নবী দাবি করে, প্রথমত সে মিথ্যাবাদী। কারণ কেউ নিজের ইচ্ছেমতো নবী হতে পারে না। নবী তো মনোনীত করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই ঘোষণা করেছেন, সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব এখন যদি কেউ নবুওত দাবি করে, সে মিথ্যাবাদী।

দ্বিতীয়ত সে কুরআন অস্বীকারকারী। কুরআনের সুস্পষ্ট ও অকাট্য হুকুম অস্বীকারকারী। তাই সে কাফের এবং তাকে যারা অনুসরণ করছে তারাও কাফের।

মির্যা কাদিয়ানীর অনুসারীরা 'আহমদিয়া মুসলিম জামাত' নামে পরিচিত। এ দেশেও তার অনুসারী রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, এতকিছুর পরেও তারা নিজেদের মুসলিম বলে প্রকাশ করে। এটা একেবারে স্পষ্ট ধোঁকাবাজি।

মিশরে ডক্টর রাশাদ খলীফা নামে এক ব্যক্তি আছে। সেও নিজেকে নবী দাবি করেছে! 'আহলে কুরআন' নামে এক ফেরকা আছে। এদের আবার অনেক ফেরকা। তাদের এক ফেরকা বলে, নামায নাকি দুই ওয়াক্ত। আরেক ফেরকা বলে, তিন ওয়াক্ত। তাদের আরো অনেক ফেরকা রয়েছে। আহলে কুরআনের অনেকে রাশাদ খলীফাকে নবী মানে- নাউযুবিল্লাহ।

তিন. এটাও বিশ্বাস করা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা যেসকল দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন সেগুলোর প্রত্যেকটি তিনি যথাযথ আদায় করেছেন। তাঁর সে দায়িত্বগুলোর বিবরণ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এই সকল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যা করেছেন এবং যা বলেছেন সবকিছু বিশ্বাস করা এবং মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া তাঁর প্রতি ঈমানের অংশ। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত এইসব দায়িত্ব পালনার্থে যা বলেছেন বা করেছেন সেটাই হাদীস ও সুন্নাহ। কুরআনের ভাষায় 'হিকমাহ' ও 'উসওয়ায়ে হাসানাহ'। সেটা গ্রহণ ও অনুসরণ করাকে কুরআন ফরয করেছে এবং মান্য করাকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করেছে।

চার. তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভালবাসা রাখা।

পাঁচ. তাঁর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। অবমাননা নয়; শুধু তাঁর সামান্য অসম্মান বা কষ্টের কারণ হয়, এমন সব কথা ও আচরণ থেকে বিরত থাকা।

ছয়. তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনকে সর্বশেষ ওহী-গ্রন্থ হিসাবে মেনে নেওয়া। তাঁর শরীয়তকে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ ইসলামী শরীয়ত হিসাবে গ্রহণ করা।

সাত. মুক্তি ও সফলতা একমাত্র তাঁর শরীয়ত ও সুন্নাহ্ অনুসরণের মাঝে- এই বিশ্বাস রাখা। এর বিকল্প খোঁজার মতো কুফরী আচরণ থেকে বেঁচে থাকা এবং এমন আচরণকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করা। তাঁর শরীয়ত ও সুন্নাহ ছেড়ে, না কোনো বিকৃত বা রহিত শরীয়তের দিকে যাওয়া যাবে, না কোনো নবআবিষ্কৃত ইজম বা মতাদর্শ গ্রহণ করা যাবে আর না নিজের খেয়াল-খুশির অনুগামী হওয়া যাবে।

এই হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান। বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের ঠিক ঠিক বোঝার তাওফীক দান করুন।

রাসূলের দায়িত্ব

বলছিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কুরআন দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে তাঁকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন। সেই দায়িত্বগুলোর বিবরণ কুরআনে কারীমে বিস্তারিত আছে। তাঁর তিনটি মৌলিক দায়িত্বের কথা একত্রে কুরআন মাজীদের তিন জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। সূরা বাকারার ১২৯ সংখ্যক আয়াতে, সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ সংখ্যক আয়াতে এবং সূরা জুমুআর ২ সংখ্যক আয়াতে।

সূরা আলে ইমরানের আয়তটি হল-

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি (অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর নিশ্চয়ই এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে ছিল। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৪

এই আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এই-

ক. يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه

তিনি মানুষকে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনাবেন। যাতে তাদের জন্য কুরআন মাজীদ শেখা ও মুখস্থ করা সহজ হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম শিখিয়েছেন তাঁদের শাগরিদদের। তাঁদের বলা হয় তাবেয়ী। তাবেয়ীগণ শিখিয়েছেন তাঁদের শাগরিদদের। এভাবেই কুরআন শিক্ষার ধারাবাহিকতা এ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

খ. وَ يُزَكِّيْهِم

তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। তাদের অন্তরকে সব ধরনের আবিলতা থেকে মুক্ত করবেন। শিরক, কুফর, নেফাকসহ যাবতীয় মন্দ স্বভাব ও চিন্তা-চেতনা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। তাদের মাঝে তৈরি করবেন সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, সুস্থ রুচিবোধ, উত্তম চরিত্র এবং উন্নত চিন্তা-চেতনা।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় পরিশুদ্ধি লাভ করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। সেজন্য তাঁরা হলেন উম্মতের সর্বোত্তম জামাত। তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, রুচি-প্রকৃতি ও আখলাক-চরিত্র সবই ছিল পরিশুদ্ধ। কারণ তাঁরা তো সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবিয়ত লাভ করেছিলেন।

গ. وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَة

তাদেরকে ‘কিতাব’ ও হিকমত’ শিক্ষা দেবেন। ‘কিতাব’ কুরআনেরই আরেক নাম। ‘হিকমত’ কী? তার আগে কথা হল, এই হিকমতও আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন। কিতাব যেভাবে তিনি নাযিল করেছেন, হিকমতও তিনি নাযিল করেছেন। সূরা নিসায় আছে-

وَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনি জানতেন না। বস্তুত আপনার প্রতি সর্বদাই আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। -সূরা নিসা (৪) : **১১৩**

অন্যত্র আরো বলেন-

وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ.

আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের লক্ষ্যে তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন তা স্মরণ রেখ। -সূরা বাকারা (২) : **২৩১**

অতএব কিতাব ও হিকমত দুই-ই আল্লাহর নাযিলকৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কিতাব শিখিয়েছেন, হিকমতও শিখিয়েছেন। হিকমত হল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং শরীয়তের সকল বিধি-বিধান।

সূরা জাসিয়ায় আল্লাহ তাআলা বলেন-

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

(হে রাসূল!) আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর রেখেছি। সুতরাং আপনি তারই অনুসরণ করুন। আর যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না, আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। -সূরা জাসিয়া (৪৫) : ১৮

তিলাওয়াত শেখানো আর তা'লীম দেওয়া- দুটো এক কথা নয়

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের তিলাওয়াত শিখিয়েছেন, আবার কুরআনের তালীমও দিয়েছেন। উভয়টাই তাঁর দায়িত্ব। প্রশ্ন হল, এই তালীম দ্বারা কী উদ্দেশ্যে? তিলাওয়াত শেখানোটাই কি তালীম? সেটা তো নয়। কারণ তিলাওয়াত শেখানোর কথা প্রথমেই রয়েছে। এরপর আছে কিতাব শিখানোর কথা। অতএব কিতাবের তিলাওয়াত শেখানো আর কিতাবের তালীম দেওয়া- দুটো এক কথা নয়। কিতাবের তালীম বলতে কী উদ্দেশ্য- সেটা কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

و ً اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

(হে নবী!) আমি আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

অতএব কুরআনের তালীম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কুরআনের কোন্ আয়াতের কী মর্ম, কোন্ আয়াতে কী বিধান, এবং সেই বিধান পালনের কী নিয়ম- এগুলো শিক্ষা দেওয়া।

রাসূলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করা এবং নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করা। সূরা আ'রাফের ১৫৭ সংখ্যক আয়াতে তার বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করবে, যাঁর কথা তারা তাদের নিকট থাকা তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পাবে, যিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবেন ও মন্দ কাজে নিষেধ করবেন এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবেন ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবেন এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবেন, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। সুতরাং যারা তাঁর (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে সম্মান করবে, তাঁর সাহায্য করবে এবং তাঁর সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম। -সূরা আ'রাফ (৭) : ১৫৭

অন্যত্র বলেন-

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ .

কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে। -সূরা তাওবা (৯) : ২৯

এই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম মৌলিক চারটি দায়িত্ব। মানুষকে কুরআনের তিলাওয়াত শেখানো, তাদের পরিশুদ্ধ করা, কুরআন ও হিকমত শিক্ষা দেয়া এবং উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করা ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করা। এগুলো ছাড়া তাঁর আরও দায়িত্ব আছে।

রাসূল শুধু ওহীর-ই অনুসরণ করেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এসব দায়িত্ব পালানার্থে যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তার কোনোটি নিজের ইচ্ছেমতো করেননি বা বলেননি; বরং সবই আল্লাহর নির্দেশে। সূরা নাজমে আছে-

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى.

তিনি মনগড়া কথা বলেন না। সেটা তো খালেস ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়। -সূরা নাজম (৫৩) : ৩-৪

সূরা আহকাফে আছে-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَاۤ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَ لَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ وَ مَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি রাসূলগণের মধ্যে অভিনব নই। আমি জানি না, আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে এবং এটাও (জানি) না যে, তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে। আমি তো কেবল আমার প্রতি যে অহী নাযিল করা হয়, তারই অনুসরণ করি। আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। -সূরা আহকাফ (৪৬) : ৯

এই আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের তাফসীর ও ব্যাখ্যা হিসাবে যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, সবই ওহীর ভিত্তিতে। তথাপি বিষয়টি কুরআনে আরো বিশেষভাবেও উল্লেখিত হয়েছে। সূরা কিয়ামায় আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ، فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ، ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ.

(হে রাসূল!) আপনি এটি (অর্থাৎ কুরআন) তাড়াতাড়ি মুখস্থ করবার জন্য তার সঙ্গে জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয় এটি (অন্তরে) সংরক্ষণ ও (মুখে) পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।

সুতরাং আমি যখন তা (জিবরীলের মাধ্যমে) পাঠ করি, আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর তার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। -সূরা কিয়ামাহ (৭৫) : ১৬-১৯

সূরা নিসায় বলেন-

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللهُ وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَآىِٕنِيْنَ خَصِيْمًا.

(হে নবী!) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য-সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষাবলম্বনকারী হবেন না। -সূরা নিসা (৪) : ১০৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইসকল কথা ও কাজকে বলে হাদীস ও সুন্নাহ। সুতরাং রাসূলের প্রতি ঈমান আনার অর্থই হল তাঁর সুন্নাহ ও হাদীসের অনুসরণ করা, তাঁর সকল কথা ও কাজ বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া এবং তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩২

অন্যত্র বলেন-

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমারাহীতে পতিত হল। -সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৬

আরো বলেন-

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

না, (হে নবী!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে। তারপর আপনি যে

রায় দেন, সে বিষয়ে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করবে না এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করবে। -সূরা নিসা (৪) : ৬৫

সাহাবা-তাবেয়ীনসহ সকল যুগের হকপন্থীগণ এভাবেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ বিনা দ্বিধায় মান্য করেছেন। তাঁর সুন্নাহকে শরয়ী বিধি-বিধানের উৎস এবং কুরআন অনুধাবনের ভিত্তি ও মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আহলে কুরআনের ফেতনা

কিন্তু দুনিয়াতে ফেতনার অভাব নেই। মানুষের ঈমান-আমল নষ্ট করার জন্য কত ধরনের কত কথা! আহলে কুরআনরা বলে, ‘আমরা শুধু কুরআন মানি। আমাদের কিছু বলতে হলে সরাসরি কুরআন থেকে দেখাতে হবে। কুরআনের বাইরে বা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করে কিছু বললে আমরা তা মানি না।’ অর্থাৎ কুরআনের ব্যাখ্যায় রাসূলের হাদীস বা সাহাবায়ে কেরামের বাণী পেশ করলে তারা তা মানতে রাজি নয়। তার মানে, যাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁর থেকে যাঁরা কুরআন শিখেছেন তাঁরা কী বুঝেছেন সেটা নয়; আমরা বা আমি যেটা বুঝেছি সেটাই আসল বুঝ- নাউযুবিল্লাহ! বলুন, এটা কি কুরআন মানা? কখনো নয়।

লক্ষ করুন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে শিখিয়েছেন। আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই তিলাওয়াত করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের ইচ্ছেমতো তিলাওয়াত করি, শব্দ পরিবর্তন করি, হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাই বা বিন্যাস পরিবর্তন করে ফেলি তাহলে কি বৈধ হবে? কখনো নয়। বরং তা হবে কুরআনের চরম বিকৃতি ও অবমাননা।

একইভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। কোন্ আয়াতের কী মর্ম, কোন্ আয়াতে কী বিধান এবং সেই বিধান পালনের কী নিয়ম- সবকিছু তিনি সাহাবায়ে কেরামকে শিখিয়েছেন। এটা তাঁর দায়িত্ব। তিনি সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। আমাদের কর্তব্য, রাসূলের শিক্ষাকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করা এবং তার আলোকে কুরআন বোঝার চেষ্টা করা। কিন্তু কেউ যদি নিজের মতো করে কুরআন বুঝতে যায় এবং রাসূলের শিক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাহলে তার কুরআনও মানা হবে না, রাসূলও মানা হবে না। আর রাসূল ও কুরআন না মানা হলে তার ঈমানের কী হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবধরনের বক্রতা থেকে হেফাযত করুন- আমীন।

কথার সৌন্দর্যে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না; আসল উদ্দেশ্য বুঝতে হবে শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। এই কুমন্ত্রণার ভাষাও হয় সুন্দর ও আকর্ষণীয়। যেমন একটা ফেরকার নাম আহলে হাদীস। মানে হাদীসের অনুসারী। প্রশ্ন হল, হাদীসের অনুসারী কে নয়? সকল মুসলমানই তো হাদীসের অনুসারী। এ হিসেবে সব মুসলমান আহলে হাদীস। তাহলে এরা কেন নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' নাম দিয়ে অন্য মুসলমানদের থেকে পৃথক করে রাখে? আসলে এই নামের পিছনে আরেকটা অংশ আছে- ইসলামী ফিকহ অস্বীকারকারী। ফুকাহায়ে কেরাম কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানগুলোকে যে বিন্যস্ত রূপ দিয়েছেন সেটাকে বলা হয়, আলফিকহুল ইসলামী বা ইসলামী ফিকহ। তারা সে ফিকহ মানে

না। অথচ নাম বলার সময় বলে ‘আহলে হাদীস’; ‘ফিকহ অস্বীকারকারী’ বলে না। কারণ পুরোটা বললে তো মানুষ ধরে ফেলবে, তাদের সমস্যাটা কী?

আহলে কুরআন নামটাও এই ধরনের। আহলে কুরআন মানে কুরআনের অনুসারী ও কুরআনওয়ালা। এ হিসেবে সব মুসলমানই তো আহলে কুরআন। রাসূলের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কুরআনের অর্থ-মর্ম শিখিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে। সাহাবায়ে কেরাম শিখিয়েছেন তাবেয়ীনকে। এভাবে যুগ যুগ ধরে কুরআন শেখা-শেখানোর ধারা চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতএব যুগে যুগে আহলে কুরআন বা কুরআনের অনুসারী বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে। তাহলে হঠাৎ এরা নিজেদের আহলে কুরআন বলে অন্যদের থেকে পৃথক করছে কেন? আসলে এ নামের পেছনে আরেকটা অংশ আছে। সেটা হলো হাদীস ও সুন্নাহ অস্বীকারকারী আর এটাই তাদের আসল পরিচয়। কুরআন শেখাতে গিয়ে এবং কুরআনের বিধি-বিধান শেখাতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, সেটাই তো সুন্নাহ, সেটাই হাদীস এবং সেটাই হিকমাহ। কিন্তু তারা এই হাদীস-সুন্নাহ মানে না। নিজেদের নাম দিয়েছে ‘আহলে কুরআন’, আসলে এরা হাদীস অস্বীকারকারী। এরা রাসূলের অবমাননা করে এবং কুরআনকে নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুগামী করে।

দেখুন, বাতিলপন্থীদের ওয়াসওয়াসার ভাষা অনেক সময় সুন্দর হয়। তাই কথার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। বরং তার দাওয়াতের পেছনে মূল উদ্দেশ্যটা কী-তা বুঝতে হবে। আহলে কুরআনের কথাই ধরুন। দাওয়াতের সময় তারা কত সুন্দর কথা বলে; কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। তবে সেটা তাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য, মানুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ থেকে বিমুখ করা। মুখে বলে কুরআনের কথা আর অন্তরে থাকে মানুষকে হাদীস থেকে বিমুখ করা।

নবআবিষ্কৃত বিষয়ে সতর্কতা জরুরি

এখানে আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে। যখনই আপনি দ্বীনী বিষয়ে এমন কথা শুনবেন, যা আপনার চারপাশের কেউ-ই বলে না, একদম নবআবিষ্কৃত বিষয়, তখন বুঝতে হবে, এটা বিভ্রান্তি এবং হেদায়েতের নামে গোমরাহি। হ্যাঁ, এমন হতে পারে, একটা বিষয় ব্যক্তি পর্যায়ে আমরা কিছু মানুষ জানতাম না। এক ভাই এসে আমাদের সংশোধন করে দিলেন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিষয়টা আরো অনেকে বলেছেন এবং সেটাই সঠিক। এমনটা হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিষয়টা যদি কেউ-ই না জানে এবং ইসলামের সাড়ে চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে এরূপ কথা কেউ না বলে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এটা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি। কারণ এরূপ হতেই পারে না- কোনো দ্বীনী আকীদা-বিশ্বাস বা শরীয়তের কোনো মৌলিক বিধানের বিষয়ে মুমিনরা হাজার বছর যাবৎ বিভ্রান্তিতে থাকবে, অতঃপর একজনের আবির্ভাব ঘটবে, আর সে প্রকৃত সত্যটা উদ্ঘাটন করবে।

কুরআন হেফাযতের মর্ম

কুরআন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন। তার হেফাযতের দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন। হেফাযত বলতে শুধু শব্দের হেফাযত নয়; শব্দ ও মর্ম উভয়েরই হেফাযত। তাই সাড়ে চৌদ্দশ বছর পরও কুরআন সংরক্ষিত ও অবিকৃত। অতএব কেউ যদি বলে বা তার দাবির ফল যদি এই হয় যে, কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার লোক চৌদ্দশ বছর যাবৎ ছিল না; এখন হঠাৎ আবিষ্কার হয়েছে কুরআন বোঝার ও কুরআন অনুযায়ী আমল করার লোক- বলুন, এটা কি বোধগম্য? আসলে আমরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাই না। বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগালে, আল্লাহর রহমতে আমরা অনেক ফেতনা থেকে বেঁচে যেতাম।

কুরআনের প্রকৃত অনুসারী দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম কুরআন শিখেছেন সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তাঁদের থেকে শিখেছেন তাবেয়ীনে কেরাম। অথচ আহলে কুরআনের কথা অনুযায়ী সাহাবা-তাবেয়ীনের কেউ-ই কুরআনের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন না এবং তাঁদের একজনও কুরআনের মর্ম যথাযথ অনুধাবনে সক্ষম হননি। কেননা,

তাঁদের কেউই কুরআন অনুসরণের নামে হাদীস অস্বীকার করেননি এবং রাসূলের সুন্নাহ থেকে বিমুখ হননি। বরং রাসূলের হাদীস ও সুন্নাহকেই তাঁরা কুরআন অনুধাবন ও অনুসরণের ভিত্তি ও মাপকাঠি বানিয়েছেন। দেখুন, তাদের মতাদর্শ তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! তাদের মতাদর্শ তো ইসলামের প্রথম সারির অনুসারীদেরকেই কুরআনের মর্ম অনুধাবন ও তার যথাযথ অনুসরণে ব্যর্থ সাব্যস্ত করছে। অথচ তাঁদের সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হল-

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْم.

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। -সূরা তাওবা (৯) : ১০০

আসলে বাতিল মতাদর্শের লোকেরা ভেবেই দেখে না, তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে; অন্ধকারের কোন্ অতল গহ্বরে তাদের ঠেলে দিচ্ছে।

সালাত : আহলে কুরআনের গোমরাহির অনেক বড় প্রকাশক্ষেত্র

আগেই বলা হয়েছে, রাসূলের শেখানো তিলাওয়াত যেমন ধারাবাহিকভাবে আমাদের নিকট রয়েছে তেমনি তাঁর শিক্ষাও আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। اَقِيْمُوا الصَّلٰوة -এর তিলাওয়াত যেভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ থেকে শিখেছি, সেটার বিধানও আমরা তাঁর থেকে লাভ করেছি। সালাত কায়েম কীভাবে করতে হবে, কখন করতে হবে এবং ফরয সালাত মোট কত ওয়াক্ত ও কত রাকাত সেটা আমরা রাসূলুল্লাহ থেকে জেনেছি। এই শিক্ষাটুকু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না পেলে আমাদের পক্ষে কুরআন অনুসরণ সম্ভব হতো না।

আহলে কুরআনদের বিভ্রান্তি ও গোমরাহির অনেক বড় একটা প্রকাশক্ষেত্র হল সালাত। তাই এ বিষয়ে কিছু বলার ইচ্ছা করছি।

সূরা বনী ইসরাঈলের এই আয়াতটি দেখুন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

(হে নবী!) সূর্য হেলার সময় সালাত কায়েম করুন রাত অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত এবং কায়েম করুন ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাতে ঘটে থাকে সমাবেশ। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়-

এক. আল্লাহ তাআলা সালাত কায়েমের আদেশ করেছেন। তবে সালাত কায়েম কীভাবে করবে- তার বর্ণনা দেননি এবং কুরআন মাজীদের কোথাও দেননি। অথচ সূরা বাকারায় বলেন-

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ، فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা পুরোপুরি যত্নবান থেকো সালাতসমূহের প্রতি এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি২। তোমরা আল্লাহর সামনে আদবের সঙ্গে অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ো। তোমরা যদি (শত্রুর) ভয় কর, তবে দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় (সালাত আদায় করে নিয়ো)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ অবস্থা লাভ কর তখন আল্লাহর যিকির সেইভাবে করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যে সম্পর্কে তোমরা অনবগত ছিলে। -সূরা বাকারা (২) : ২৩৮-২৩৯

এখানে-

فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ .

(অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ অবস্থা লাভ কর তখন আল্লাহর যিকির সেইভাবে করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যে সম্পর্কে তোমরা অনবগত ছিলে।)-অংশটি খেয়াল করুন। আগ-পর থেকে স্পষ্ট, এখানে যিকির বলতে যেকোনো যিকির উদ্দেশ্য নয়; বরং সালাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ভীতিকর পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে তোমরা দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে। এরপর পরিস্থিতি নিরাপদ হয়ে এলে তোমরা সেই নিয়মে সালাত

আদায় করবে, যে নিয়ম তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রশ্ন হল, সে নিয়ম তো কুরআনে নেই; আমরা কোথেকে শিখলাম? আল্লাহ আমাদের কীভাবে শেখালেন? উত্তর স্পষ্ট, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিখেছি। তিনি তাঁর সুন্নাহ ও হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়েছেন। রাসূলের এ শেখানোকেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 'আল্লাহর শেখানো'। ইরশাদ হয়েছে- كَمَا عَلَّمَكُم অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেখানো সালাতের পদ্ধতি থেকে বিমুখ হওয়া মানে আল্লাহর শেখানো পদ্ধতি থেকে বিমুখ হওয়া।

রাসূলের শিক্ষাদানের পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহর কাছে সালাতের পদ্ধতি সর্বপ্রথম শিখেছেন সাহাবায়ে কেরাম। তিনি তাঁদের মৌখিকভাবেও শিখিয়েছেন আবার নিয়মিত তাঁদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করে তার বাস্তব রূপও দেখিয়েছেন। আর বলেছেন-

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

তোমরা সেইভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০০৮

এরপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়ীন, তাঁদের থেকে তাবে তাবেয়ীন। এভাবে প্রত্যেক উত্তরসূরী তাদের পূর্বসূরীদের থেকে শিখেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে।

শেখা-শেখানোর এই পন্থা কেবল সালাতেই নয়; অন্যান্য আমলেও ৩। যেমন হজ্বের বিষয়ে আল্লাহর হুকুম-

وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর ফরয আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্ব করা। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯৭

কিন্তু হজ্বের সম্পূর্ণ বিধান কুরআন মাজীদে নেই। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি যেন মানুষকে হজ্বের পূর্ণাঙ্গ বিধান শিক্ষা দেন। বিদায় হজ্বে তিনি বলেন-

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجّ بَعْدَ حَجّتِي هَذِهِ.

তোমরা (আমার কাছ থেকে) হজ্বের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। কারণ আমি জানি না, এই হজ্বের পর আমি আর হজ্ব করতে পারব কি না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২৭৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৯৭০

দুই. এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলার সময় থেকে রাত অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় কর। আয়াতের শাব্দিক অর্থ তো এমনই। এখন কেউ যদি

রাসূলুল্লাহর ব্যাখ্যা ও সুন্নাহ ছেড়ে শুধু শাব্দিক তরজমা নিয়ে বসে থাকে,৪ তাকে তো সূর্য হেলার সময় থেকে রাত অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত সালাতেই থাকতে হবে!

এবার সূরা হুদের এই আয়াতটি দেখুন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكۡرٰی لِلذّٰكِرِیۡنَ

(হে নবী!) আপনি দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ।' -সূরা হূদ (১১) : ১১৪

প্রশ্ন হল, কোন্ সালাতের নির্দিষ্ট সময় কতটুকু, যার আগে সালাত আদায় করলে তা ধর্তব্য হবে না আর তার পরে আদায় করলে যথাসময়ে সালাত আদায়কারী বিবেচিত হবে না? আমরা লক্ষ্য করেছি, বিষয়টা এই দুই আয়াতে নেই এবং কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতে নেই। অথচ সূরা নিসায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

নিঃসন্দেহে সালাত মুমিনদের উপর সময়াবদ্ধ ফরয। -সূরা নিসা (৪) : ১০৩

এই সময়াবদ্ধতার পরিপূর্ণ বিবরণ কুরআনে মাজীদে নেই; আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহয়। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা। তাঁর শেখানো ওয়াক্ত মোতাবেক সালাত আদায় করার বিষয়েই কুরআন বলছে-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

(নিঃসন্দেহে সালাত মুমিনদের উপর সময়াবদ্ধ ফরয।)

তাই রাসূলের শেখানো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা অমান্য করা মানে- কুরআনের এই ফরয বিধানের অবজ্ঞা করা।

হাদীস ও সুন্নাহয় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা

হাদীসে আছে, বুরায়দা রা. থেকে বর্ণিত-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ: صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ - فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ بِهَا، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ.

এক ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি এ দুদিন আমাদের সঙ্গে সালাত পড়'।

প্রথম দিন (মধ্যাহ্নের) সূর্য (কিছুটা পশ্চিমে) হেলে যাওয়ার পর বেলাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে যোহরের আযান দিলেন অতঃপর ইকামত দিলেন। এরপর সূর্য উপরে সাদা থাকাবস্থায়ই বিলাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আসরের আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। এরপর সূর্যাস্তের পর মাগরিব এবং শাফাক (পশ্চিমাকাশের আলোক-আভা) অস্তমিত হওয়ার পর এশার সালাত আদায় করলেন।

দ্বিতীয় দিন বেলাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে যোহরের আযানে বিলম্ব করলেন। রোদের তাপ অনেক ঠাণ্ডা হওয়ার পর যোহরের সালাত আদায় করা হল। এরপর আসরের সালাতও বিলম্বিত করা হল এবং সূর্য কিছুটা উচ্চতায় থাকাবস্থায় সালাত আদায় করা হল। এরপর মাগরিব শাফাক (পশ্চিমাকাশের আলোক-আভা) অস্তমিত হওয়ার (কিছু) আগে আদায় করা হল এবং এশা রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করা হল। ফজরের সালাত চারদিকে ভালোভাবে ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই প্রশ্নকারীকে ডাকলেন। সাহাবী উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই দুই সময়ের মধ্যেই তোমাদের সালাতের সময় নির্ধারিত।' -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬১৩

এছাড়াও আরো অনেক হাদীস ও আসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে সালাতের ওয়াক্ত সংক্রান্ত নির্দেশনা বর্ণিত রয়েছে।

বিখ্যাত মুফাসসির হাফিযুল হাদীস ইবনে কাসীর রাহ. (৭৭৪ হি.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ সংখ্যক আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وَقَدْ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاتُرًا مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ بِتَفَاصِيلَ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، عَلَى مَا عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ، مِمَّا تَلَقَّوْهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ.

অর্থাৎ (সালাতের) এই ওয়াক্তগুলোর বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নিয়মটি নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ফরয স্তরের) সুন্নাহ। এই সুন্নাহ তাঁর বহু কওলী ও ফে'লী হাদীস দ্বারা তাওয়াতুরের সঙ্গে প্রমাণিত। যুগ যুগ ধরে তা মুসলিম উম্মাহ্র সম্মিলিত কর্মধারা। প্রত্যেক যুগের উত্তরসূরীরা তাদের পূর্বসূরীদের থেকে তা গ্রহণ করেছে। এভাবে আমলের ধারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। -তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৮৯

কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ

সুতরাং পূর্বোল্লিখিত সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ সংখ্যক আয়াত এবং সূরা হূদের ১১৪ সংখ্যক আয়াতের কী অর্থ- সেটা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মাধ্যমে বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ সূর্য হেলার সময় থেকে রাত অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত এই পুরোটা সময় সালাতে থাকতে হবে না। বরং এটাকে চার ভাগ করা হয়েছে; অর্থাৎ চার ওয়াক্ত- যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। প্রত্যেক ওয়াক্তের শুরু-শেষ নির্ধারিত। পঞ্চম ওয়াক্ত ফজর। সেটা এই আয়াতে قُرْاٰنَ الْفَجْر শব্দে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বমোট পাঁচ ওয়াক্ত। আর সূরা হূদের আয়াতে, দিনের দুই প্রান্তের প্রথম প্রান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য ফজর আর দ্বিতীয় প্রান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য যোহর ও আসর। রাতের কিছু অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য মাগরিব ও এশা- এই মোট পাঁচ ওয়াক্ত। অতএব এই দুই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ করা হয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা কুরআন মাজীদের আরো আয়াতে আছে। যেমন সূরা রূমে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ، وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ.

আয়াতের তরজমা এই-

তোমরা আল্লাহর তাসবীহতে রত থাক যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা ভোরের সম্মুখীন হও। এবং তাঁরই প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। বিকেল বেলায় (তাঁর তাসবীহতে রত হও) এবং যোহরের সময়। -সূরা রূম (৩০) : ১৭-১৮

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী। তাঁর জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন-

اللهُمّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ.

হে আল্লাহ, আপনি তাকে কুরআন শিখিয়ে দিন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৩৭৯

রাসূলের এই দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। তাই তাঁর উপাধি 'রঈসুল মুফাসসিরীন'-মুফাসসিরগণের সরদার। তিনি এই আয়াতে তাসবীহের ব্যাখ্যা করেছেন সালাত। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা কোন্ আয়াতে আছে? তিনি উত্তরে এই দুই আয়াত এবং সূরা নূরের ৫৮ সংখ্যক আয়াতের কিছু অংশ তিলাওয়াত করলেন, যাতে এশার সালাতের কথা আছে। আসারটি মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (১৭৭২), আলমুজামুল কাবীর তবারানী (১০/২৪৭-২৪৮), তাফসীরে তবারী (১৮/৪৭৪), মুসতাদরাকে হাকেম (৩৫৮৩) ও সুনানে কুবরা বায়হাকী (৩/৩৫৯)সহ অনেক কিতাবে আছে। আমরা এখানে আসারটি মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক থেকে সনদসহ উল্লেখ করছি-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَاصَمَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ ابْنَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ: فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ: الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ، وَ عَشِيًّا: الْعَصْرُ، وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ : الظُّهْرُ، قَالَ: وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآء.

অর্থাৎ নাফে' ইবনে আযরাক নামক এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা পেয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর তিলাওয়াত করলেন, فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْن (অর্থাৎ) মাগরিব ও ফজর, ' وَ عَشِيًّا' : আসর, 'وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْن' : যোহর। এরপর তিলাওয়াত করলেন, وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآء (অর্থাৎ এশা)। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস ১৭৭২

قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

অতএব এখানে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ পেলাম। حِيْنَ تُمْسُوْن -এ মাগরিব ও এশা, وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْن -এ ফজর, وَ عَشِيًّا -এ আসর এবং وَ حِيْنَ تُظْهِرُوْن -এ যোহর-এই মোট পাঁচ ওয়াক্ত।

সূরা রূমের আয়াতের অনুরূপ আয়াত আছে সূরা ত্ব-হায়। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন-

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا وَ مِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى.

সুতরাং (হে নবী!) তারা যেসব কথা বলে, তাতে সবর করুন। আর সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ ও হামদে রত থাকুন। রাতের মুহূর্তগুলোতেও তাসবীহতে রত থাকুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩০

এখানে তাসবীহ ও হামদের কী অর্থ? জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ -، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, শোন! অচিরেই তোমাদের রবকে তোমরা দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে গিয়ে তোমরা পরস্পর ভিড়ের চাপে পড়বে না। যদি তোমরা সক্ষম হও তবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে সালাত আদায়ে পিছপা হয়ো না। অর্থাৎ আসর ও ফজর। এরপর জারীর রা. তিলাওয়াত করলেন-

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا

(আর সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ ও হামদে রত থাকুন।) -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩৩; সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৫৪

এখানে এটা স্পষ্ট, বিখ্যাত সাহাবী জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. তাসবীহ ও হামদ শব্দ থেকে সালাত অর্থই বুঝেছেন। তাছাড়া আরবী ভাষায় এ ধরনের ব্যবহার অপরিচিত কিছু নয়। একটি সমগ্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করে পুরো সমগ্রটিকে বোঝানো- এটি আরবী ভাষায় অতি পরিচিত একটি রীতি। কুরআন মাজীদেই এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে, এমনকি সালাতের

ক্ষেত্রেই। যেমন ইতিপূর্বে আমরা সূরা বাকারার ২৩৯ সংখ্যক আয়াতে দেখেছি; সেখানে যিকির শব্দটি সালাতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আরো কিছু আয়াত দেখুন-

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

এবং যারা রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে (কখনও) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনও) দণ্ডায়মান অবস্থায়। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৬৪

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا...

যে রাতের মুহূর্তগুলোতে ইবাদত করে, (কখনও) সিজদাবস্থায় এবং (কখনও) দাঁড়িয়ে...। -সূরা যুমার (৩৯) : ০৯

وَ اِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّ طَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْقَآئِمِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সেই ঘর (অর্থাৎ কাবাগৃহ)-এর স্থান জানিয়ে দিয়েছিলাম। (এবং তাঁকে হুকুম দিয়েছিলাম,) আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবেন না এবং আমার ঘরকে সেইসকল লোকের জন্য পবিত্র রাখুন, যারা (এখানে) তওয়াফ করে, দাঁড়ায় ও রুকূ-সিজদা করে। -সূরা হজ্ব (২২) : ২৬

এই আয়াতসমূহে দাঁড়ানো ও রুকূ-সিজদার কথা আছে। কিন্তু স্পষ্ট, এখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকা বা রুকূ-সিজদা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করাই উদ্দেশ্য।

সুতরাং প্রতীয়মান হল, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা কুরআন মাজীদে আছে। একসঙ্গেও আছে, যেমন সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ সংখ্যক আয়াতে ও সূরা হূদ-এর ১১৪ সংখ্যক আয়াতে। আবার আলাদাভাবেও দু-এক ওয়াক্তের কথাও আছে, যেমন সূরা নূরের ৭৮ সংখ্যক আয়াতে এশার সালাতের কথা আর সূরা বাকারার ২৩৮ সংখ্যক আয়াতে আসরের সালাতের কথা।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদিসম্মত আকীদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদিসম্মত আকীদা হল, ‘দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয- ফজর, যোহর,

আসর, মাগরিব ও এশা। ফজরের সালাত দুই রাকাত (ফরয), যোহরের সালাত চার রাকাত (ফরয), আসরের সালাত চার রাকাত (ফরয), মাগরিবের সালাত তিন রাকাত (ফরয) এবং এশার সালাত চার রাকাত (ফরয)। জুমার দিন যোহরের পরিবর্তে জুমার সালাত দুই রাকাত (ফরয) এবং মুসাফিরদের জন্য চার রাকাতের সালাত দুই রাকাত। এ বিষয়ে কারও কোনো ইখতিলাফ নেই। সালাতের শাখাগত কিছু বিষয়ে হয়ত ইখতিলাফ আছে। যেমন, আমীন আস্তে বলা-জোরে বলা, ইমামের পিছনে কিরাত পড়া-না পড়া, রফয়ে ইয়াদাইন করা-না করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে দলীলের আলোকে ইখতিলাফ হয়েছে আর ইখতিলাফের শর্ত ও আদব বজায় রেখে তা প্রকাশের সুযোগও রয়েছে। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং সেগুলোর ওয়াক্ত ও রাকাত সংখ্যা নিয়ে কারো

কোনো ইখতিলাফ নেই এবং তার সুযোগও নেই। এসবের কোনো একটিকে অস্বীকার করা বা বিকৃত করা স্পষ্ট কুফুরী।

সালাত বিষয়ে আহলে কুরআনের বিকৃতি

কিন্তু আফসোস, শত আফসোস নব্য 'আহলে কুরআন'-এর প্রতি। এরা দ্বীনের এই স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ববাদিসম্মত বিষয়েও চরম বিকৃতি ঘটিয়েছে। তাদের এক দলের মতে সালাত তিন ওয়াক্ত; আরেক দলের মতে দুই ওয়াক্ত। আর সকল সালাত দুই রাকাত! নাউযুবিল্লাহ। এই হল তাদের কুরআন অনুসরণ!

তাদের দাবি, কুরআন মাজীদে তারা নাকি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পায়নি। তাদের একদল পেয়েছে তিন ওয়াক্ত, আরেক দল দুই ওয়াক্ত। আর রাকাত পেয়েছে দুই রাকাত। অথচ ইতিপূর্বে আমরা কুরআনে কারীম থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ দেখিয়েছি। আর রাকাত সংখ্যা নিয়ে তারা যা বলে সেটা তাদের আরেক বিকৃতি। এ সম্পর্কে সামনের কোনো সংখ্যায় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আশ্চর্যের বিষয়, তারা নাকি কুরআনে জুমার সালাতের (সালাতুল জুমুআর) বিবরণ পায়নি! অথচ কুরআনে 'জুমুআ' নামে স্বতন্ত্র একটি সূরাই আছে এবং সেখানে জুমার সালাতের নির্দেশ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! জুমার দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। অতঃপর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা যমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। এবং আল্লাহকে স্মরণ কর বেশি বেশি যাতে তোমরা সফলকাম হও। -সূরা জুমুআ (৬২) : ৯-১০

রাসূলের সুন্নাহ এবং মুমিনদের ইজমা ও ঐকমত্যের গুরুত্ব

কথা হল, যদি ধরেও নিই, কুরআন মাজীদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আলোচনা নেই, তাতে কী হয়েছে? পাঁচ ওয়াক্ত সালাত রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তিনি নিজে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন এবং উম্মতকে তা শিখিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন দান করেছেন। তাঁর সাক্ষ্যের দ্বারা আমরা বিশ্বাস করেছি- এটি আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব। তিনিই আমাদের জানিয়েছেন (আর তিনি যে জানিয়েছেন সেটা তাঁর থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত), আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন- ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। ফজরের সালাত দুই রাকাত (ফরয), যোহরের সালাত চার রাকাত (ফরয), আসরের সালাত চার রাকাত (ফরয), মাগরিবের সালাত তিন রাকাত (ফরয) এবং এশার সালাত চার রাকাত (ফরয)। এসব তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন। এবার বলুন, তাঁর এই কথা বিশ্বাস না করার

কী কারণ থাকতে পারে? 'কুরআনে এর আলোচনা নেই'- এই কারণে কি তাঁর কথা অবিশ্বাস করা যাবে?

দেখুন, اَقِمِ الصَّلٰوة (হে নবী! আপনি সালাত আদায় করুন।) বলে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের আদেশ করেছেন। জানা কথা, এতে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ই আদিষ্ট। অনেক আয়াতে اَقِيْمُوا الصَّلٰوة (তোমরা সালাত আদায় কর।) বলে রাসূলুল্লাহসহ পুরো মুসলিম উম্মাহকে সালাতের আদেশ করেছেন। তবে সালাত কতবার, কোন্ সময়, কত রাকাত এবং তা কীভাবে আদায় করবে- সেটা আল্লাহ তাআলাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়েছেন। অতঃপর তিনি সেভাবেই তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন।

এখন কেউ যদি এমন করে- রাসূলের কথায় সে তো বিশ্বাস করল, اَقِمِ الصَّلٰوة ও اَقِيْمُوا الصَّلٰوة কুরআনের আয়াত; কিন্তু আল্লাহ যে রাসূলকে এই আয়াতদ্বয়ের মর্ম এবং তার বিধান আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়েছেন, সেটা সে রাসূলের কথায় বিশ্বাস করতে পারল না। তাহলে বলুন, এটা কেমন ঈমান এবং কুরআনের কেমন অনুসরণ?! আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের এ কেমন রূপ?!

নবউদ্গত ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত এই বিচ্ছিন্ন কিছু লোক ছাড়া আজকের পুরো মুসলিম উম্মাহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিষয়ে একমত। তাদের বিশ্বাস এবং আমল এক ও অভিন্ন। এটি তারা গ্রহণ করেছে তাদের পূর্বসূরীদের থেকে। তারা গ্রহণ করেছে তাদের পূর্বসূরী থেকে। এভাবে

তা যুগপরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তার মানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মাহর নিকট একটি স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ববাদিসম্মত বিষয়।

তাহলে বলুন, এরূপ প্রতিষ্ঠিত বিষয় অস্বীকারের কী যুক্তি? শুধু কি এই যে, কুরআনে তার উল্লেখ নেই? আহলে কুরআন নামধারীরা তো এই ছুতো দিয়েই সব অস্বীকার করে দেয়।

দেখুন, কুরআন নিজেই নিজের পরিচয় বলেছে। কুরআন কী, কুরআন কে নাযিল করেছেন, কুরআন কার উপর নাযিল হয়েছে, কুরআনের ব্যাখ্যা কে করবেন, কে কুরআন শেখাবেন, কুরআনের বিধানগুলো কার থেকে গ্রহণ করতে হবে, কুরআন অনুসরণের নিয়ম কী- এই সবকিছু কুরআনে রয়েছে। কুরআন বলছে, কুরআনের ব্যাখ্যা করবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি শেখাবেন কুরআন, তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে কুরআনের বিধি-বিধান। কুরআন এটাও বলছে, কোনো বিষয়ে মুমিনগণ একমত হলে এবং সকল মুমিন কোনো একটি পথ গ্রহণ করলে তা থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। এটাই কুরআনের শিক্ষা।

দেখুন সূরা নিসার আয়াত-

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا

আর যে ব্যক্তি তার সামনে হেদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা। -সূরা নিসা (৪) : ১১৫

এ আয়াত পড়ুন আর 'আহলে কুরআনের' কর্মকাণ্ড দেখুন। এরা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহও মানে না এবং মুমিনদের পথও অনুসরণ করে না।৫ এরা মুমিনদের স্বতঃসিদ্ধ সর্ববাদিসম্মত এবং অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোকে স্বীকার করে না। অথচ তাদের দাবি, তারা 'আহলে কুরআন'! তাদের অবস্থা দেখে কুরআন মাজীদের এই আয়াত মনে পড়ে-

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَ نَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ

তারা বাণীসমূহকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একটি বড় অংশ ভুলে যায়। -সূরা মায়েদা (৫) : ১৩

আহলে কুরআনের ফেতনা কোনো সাধারণ ফেতনা নয়; অনেক ভয়াবহ ফেতনা। তারা যে ছুতো ধরে এগুচ্ছে, ধীরে ধীরে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সুন্নাহ এবং মুসলিম উম্মাহর অনেক স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ববাদিসম্মত বিষয়কে অস্বীকার বা বিকৃত করে ফেলবে। একেকবার একেক বিষয় নিয়ে আওয়াজ তুলবে আর বলবে, ‘এটা কুরআনে নেই; আমরা তা মানি না।’

আজ থেকে বিশ-বাইশ বছর আগের কথা। মারকাযুদ দাওয়াহয় তাদের দুজন লোক এসেছিল। এসে বলে, ‘এই যে-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.

-এটা আপনারা কোথায় পেয়েছেন? অর্থাৎ ঈমানের কালিমা নিয়েই তাদের সংশয়; নাউযুবিল্লাহ।

এ ফেতনা সম্পর্কে রাসূলের সতর্কবাণী

এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি উম্মতকে এদের বিষয়ে সতর্ক করে গিয়েছেন। মিকদাম ইবনে মা‘দীকারিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ.

শুনে রাখ! হয়ত এমন ব্যক্তির উদ্ভব হবে যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে; তখন তার কাছে আমার কোনো হাদীস পৌঁছলে সে বলে উঠবে, আমাদের মাঝে এবং তোমাদের

মাঝে তো আল্লাহর কিতাবই আছে। এতে আমরা যা হালাল হিসেবে পাব তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করব আর যা হারাম হিসেবে পাব তা হারাম মনে করব। অথচ (প্রকৃত অবস্থা হল এই

যে,) রাসূলুল্লাহ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতই হারাম। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৬৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১২

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

দ্বীনী বিষয়ে প্রশ্ন করার নিয়ম

আসলে যারা বলে, 'কুরআন থেকে সবকিছু দেখাতে হবে; কুরআনের বাইরে কিছু বললে মানা যাবে না'- তাদের এই কথা একদম ভুল। যে কোনো দ্বীনী বিষয়ে প্রশ্ন করার নিয়ম আছে। বলতে হবে, বিষয়টা আমাকে কুরআনে দেখান; নতুবা কুরআন যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর সুন্নাহয় দেখান; না হয় কুরআন-সুন্নাহ যেসব বিষয়কে শরীয়তের বিধি-বিধানের উৎস বা দলীল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেসব বিষয় থেকে দেখান। তাহলেই কথা পুরা হবে। কারণ বিষয়টা হয়ত কুরআনে থাকবে কিংবা রাসূলের সুন্নাহয় থাকবে অথবা কুরআন-সুন্নাহ যেসব বিষয়কে শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেসবের কোনোটিতে থাকবে। অতএব 'সবকিছু কুরআন থেকে দেখাতে হবে'- এটা একেবারে বেমক্কা কথা।

রাসূল সম্পর্কে 'আহলে কুরআনের' ধারণা

কিন্তু 'আহলে কুরআনের' কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট, এরা কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের দলীলাদি সম্পর্কে একদম বেখবর। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা যেরূপ ধ্যান-ধারণা পোষণ করে তা অত্যন্ত অসম্মানজনক। কারণ, তাদের কাথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডের দাবি তো এই যে, তাদের ধারণায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ হল ডাকপিয়নের কাজ! ডাকপিয়নের কাজ হল গ্রাহকের হাতে পত্র ধরিয়ে দেয়া। ব্যস, এই তার কাজ। এরপর পত্রে কী আছে, কোন্ কথার কী অর্থ এবং তা বাস্তবায়নের কী পদ্ধতি- এইসব

বোঝা গ্রাহকের নিজের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে পিয়ন তাকে কোনো নির্দেশনা দেয় না; পিয়নের কাজ তো শুধু পত্র পৌঁছে দেয়া। আহলে কুরআন নামধারীরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ ও দায়িত্বকে এই স্তরে নামিয়ে এনেছে। নাউযু বিল্লাহ।

রাসূলের দায়িত্ব কী এবং কী তাঁর মর্যাদা- সেটা তো কুরআনেই আছে। আল্লাহ তাআলাই কুরআনে বলে দিয়েছেন, রাসূলের পরিচয় কী, তাঁর দায়িত্ব কী এবং কেন তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে পঠিয়েছেন। কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কে। বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ হলে আল্লাহ তাআলা এতগুলো আয়াতে তার অবতারণা করেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করছি-

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ.

আমি প্রত্যেক রাসূলকে কেবল এ লক্ষ্যেই পাঠিয়েছি, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। -সূরা নিসা (৪) : ৬৪

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

(হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩১

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ- এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে। -সূরা আহযাব (৩৩) : ২১

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যারা (তাঁর আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি (হে নবী!) আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠাইনি (যে, তাদের কাজের দায়-দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে।) -সূরা নিসা (৪) : ৮০

وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ، وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا، ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ، وَ كَفٰى بِاللهِ عَلِيْمًا.

যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেইসকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সঙ্গে। কত উত্তম সঙ্গী তাঁরা!

এটা কেবলই আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব। আর (মানুষের অবস্থাদি সম্পর্কে) ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। -সূরা নিসা (৪) : ৬৯-৭০

وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। -সূরা হাশর (৫৯) : ০৭

এ আয়াত প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তাবেয়ী আলকামা রাহ. থেকে বর্ণিত-

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَات،وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর লানত ঐসমস্ত নারীর প্রতি, যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকন করে ও নিজ শরীরে উল্কি অংকন করায় এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রু-চুল

উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারী।

তাঁর এ কথা আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নাম্নী এক মহিলার কাছে পৌঁছল। সে এসে বলল, আমি জানতে পেরেছি, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লানত করেন। ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমি কেন এমন লোকদের প্রতি লানত করব না, যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন এবং যাদের কথা আল্লাহর কিতাবে আছে? মহিলাটি বলল, আমি তো দুই ফলকের মাঝে যা আছে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ কুরআন) পড়েছি; কিন্তু আপনি যা বলছেন সেটা তো পাইনি। তিনি বললেন, তুমি যদি (ভালোভাবে বুঝে-শুনে) পড়তে তবে অবশ্যই পেতে। তুমি কি পড়নি-

وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

(অর্থাৎ রাসূল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।)? মহিলাটি বলল, হাঁ। বললেন, তিনিই তো নিষেধ করেছেন এ থেকে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৫

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে ‘কুরআনে নেই’ বলে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য এই ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে।

দেখুন, কথার শেষ নেই। না মানতে চাইলে কত অজুহাতই তো মানুষ দাঁড় করায়। তবে হক গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে এবং সত্যটা কী তা বোঝার আগ্রহ থাকলে, যেটুকু আলোচনা করা হল, ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে।

আমাদের করণীয়

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ اِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ.

(হে নবী!) আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর তাঁর পথে কেবল তাকেই আনয়ন করেন, যে (তাঁর) অভিমুখী হয়। -সূরা রা‘দ (১৩) ২৭

তাই কুরআনের এই দুআটি আমরা বেশি বেশি পাঠ করি-

رَبَّنَا لَا تُزِغْ

قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে যখন হেদায়েত দান করেছেন, তারপর আর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই মহাদাতা। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯

আর যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি। হাতে-পায়ে ধরে হলেও বোঝাই। দেখুন, বিষয়টা অনেক গুরুতর। কিছু বিষয় এমন, যাতে দলীলের আলোকে ইমামগণের মাঝে একাধিক মত হতে পারে। এটা সে ধরনের বিষয় নয়। এটা তো ঈমান-কুফরের বিষয়। এটা ঈমান আর ওটা কুফর। এটা হেদায়েত আর ওটা গোমরাহী। কিন্তু তারা ভুল বুঝেছে অথবা কেউ তাদের কুমন্ত্রণা দিয়েছে; কোনো একটা সমস্যা তাদের হয়েছে। সেজন্য হাতে-পায়ে ধরে হলেও তাদের ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে। দুআ করতে হবে, বোঝাতে হবে এবং আলেম-উলামার মজলিসে নিয়ে যেতে হবে। এরপর তারা নিজেরাও যদি নিজেদের জন্য দুআ করেন এবং সত্যটা বোঝার চেষ্টা করেন, আশা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের হেদায়েত দান করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং সিরাতে মুসতাকীমের উপর অবিচল রাখুন- আমীন।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.

টীকা :

১. এখানে কট্টরপন্থী আহলে হাদীসের কথা বলা হয়েছে, যারা ফিক্হ ও ফুকাহায়ে কেরামের অবমাননা করে। 'আহলে হাদীস' বলতে মূলত বোঝানো হয়, 'হাদীস'-এর আমানত ধারণকারী

হাদীসের হাফেযগণ এবং হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণকে। এই নাম উক্ত ফেরকার লোকেরা নিজেদের জন্য অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। তবে হাঁ, এই ফেরকার সকলের ভ্রান্তি একপর্যায়ের নয়। কারণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্ছিন্নতা তাদের সকলের একরকম নয়।

এখানে তাদের আলোচনা এসেছে, নামের ভুল ব্যবহার এবং নামের মধ্যে নিজেদের মন্দ দিকটি উহ্য রাখা প্রসঙ্গে।

২. الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থ মধ্যবর্তী সালাত। মধ্যবর্তী সালাত বলতে কী উদ্দেশ্য- সেটা কুরআনে নেই। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছেন। এরপর তিনি সেটা তাঁর হাদীসের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন। সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

صَلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ العَصْرِ.

মধ্যবর্তী সালাত হল, আসরের সালাত। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৮১

قال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৩. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনই তো ছিল কুরআন অনুসরণ। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের রাহ. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বললেন-

أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟

তুমি কি কুরআন পড় না?

বললেন, পড়ি। আয়েশা রা. বললেন-

فَإِنّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ الْقُرْآنَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র তো ছিল কুরআন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৬ অর্থাৎ কুরআনই ছিল তাঁর আদর্শ। কুরআনের বাস্তবরূপই ফুটে উঠেছিল তাঁর জীবন ও চরিত্রে।

৪. আজকাল অনেকে কুরআন-সুন্নাহর ইলমকে হালকা মনে করেন। ভাবেন, গবেষণার জন্য ভাষাটাই কেবল আড়াল। ভাষাটা জানতে পারলে কিংবা অন্তত কোনো অনুবাদগ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারলে আর কোনো সমস্যা নেই। এটা একদম ভুল চিন্তা। এ সম্পর্কে মাসিক আলকাউসারের মুহাররম ১৪২৬হি. (ফেব্রুয়ারি ২০০৫) সংখ্যায় 'গবেষণা : অধিকার ও

নীতিমালা’ শিরোনামে বান্দার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সেটি ‘নির্বাচিত প্রবন্ধে’ (খ. ১, পৃষ্ঠা ২৪১-২৪৯) ছাপা হয়।

সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো আরবী কে জানে? অথচ তাঁরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অল্প অল্প করে কুরআন মাজীদ শিখতেন। তাবেয়ী আবু আবদুর রহমান আসসুলামী রাহ. বলেন-

حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ.

আল্লাহর রাসূলের যে সকল সাহাবী আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, তাঁরা বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁরা দশ আয়াত করে পড়তেন। দশ আয়াতের ইলম ও আমল শেখা শেষ না হলে অন্য দশ আয়াত শুরু করতেন না। তাঁরা বলেন, আমরা ইলম ও আমল উভয়টা শিখেছি। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৪৮২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩০৫৪৯; তাবাকাতে ইবনে সা‘দ, খ. ৬ পৃষ্ঠা ৪৪৯; শরহু মুশকিলিল আসার, তাহাবী, হাদীস ১৪৫১

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. বলেন-

عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فاتحتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ أُوقِفُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ، وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا.

আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সামনে মুসহাফ (কুরআন) রেখে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। প্রতি আয়াতে তাঁকে প্রশ্ন করেছি। -আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী, হাদীস ১১০৯৭; ফাযায়েলুস সাহাবা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, খ. ২ পৃষ্ঠা, ৪৯৯

এই হল সাহাবা-তাবেয়ীনের কুরআন শেখার পদ্ধতি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দান করুন- আমীন।

৫. মনে রাখতে হবে, মুমিনদের পথ রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ ও শিক্ষার বাইরে কিছু নয়। মুমিনদের পথ তো রাসূলুল্লাহর শিক্ষা মোতাবেকই। তাঁর শিক্ষার উপরই মুমিনরা প্রতিষ্ঠিত। এজন্য সকল মুমিন যে পথে সে পথ ভুল হতে পারে না। কাজেই কেউ এ পথ থেকে বিচ্যুত হলে তার গোমরাহি নিশ্চিত।

আল্লামা আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহু

(মাসিক আল কাউসার)

আহলে কুরআনদের বিভ্রান্তি ও তা নিরসনের উপায়

বর্তমানে ‘আহলে কুরআন’ নামক দলটি চারটি উপদলে বিভক্ত। যথা : (১) উম্মাতু মুসলিম আহলুয-যিকর ওয়াল কুরআন (২) উম্মাতুন মুসলিমাতুন (৩) তুলূউ ইসলাম এবং (৪) তাহরীকু তা‘মীর ইসলাম’।[৩]

ইসলামের নামে যে সমস্ত মাযহাব, দল ও মতবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে তাদের স্বধর্মভ্রষ্টতা, পদস্খলিতা ও অধঃপতনের বিষয়টি পরিস্ফুটিত করার সর্বাধিক সহজবোধ্য ও সহজলব্ধ উপায় হল তার উৎপত্তিকাল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত বা তথ্যাভিজ্ঞ হওয়া। কেননা হাদীছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.ْ

‘বানী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বানী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সব দলগুলোই জাহান্নামী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! সে দল কোন্টি? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত’।[৪]

উপরিউক্ত হাদীছের আলোকে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, যারাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর ছাহাবীগণের আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে, বিবিধ দলসমূহের মধ্য হতে শুধু তারাই প্রকৃত ইসলামের ও হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর তারাই সফলতা, সার্থকতা এবং পরিত্রাণ পাবে।

আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আহলে কুরআনদের অবস্থান

প্রকৃতপক্ষে এদের ‘আহলে কুরআন’ না বলে ‘মুনকিরুল হাদীছ বা হাদীছ অস্বীকারকারী’ বলা উচিত। কেননা কুরআন মান্যকারীদের উপর হাদীছ মানা অপরিহার্য। বস্তুত আল-কুরআনের মধ্যেই হাদীছের প্রামাণিকতা বিদ্যমান। হাদীছের সত্যতা ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কেউ ‘আহলে কুরআন’ হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

‘কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের অন্তরে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়’ (সূরা আন-নিসা : ৬৫)। তিনি আরো বলেন,

وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ * وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর’ (সূরা আল-হাশর : ৭)। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

‘আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়’ (সূরা আন-নাজম : ৩-৪)। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا

‘আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কতই না মন্দ আবাস!’ (সূরা আন-নিসা : ১১৫)। তিনি আরো বলেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ (সূরা আলে ‘ইমরান : ৩১)।

হাদীছের প্রামাণিকতায় এ রকম আরো সহস্র আয়াত বিদ্যমান। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, ‘আহলে কুরআন’ নামক দলটি কুরআন-সুন্নাহ্ ও শরী‘আতের দলীলাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

নাম আহলে কুরআন হলেও কিন্তু আসলে তারা কুরআনের কিছুই বুঝে না। আর বুঝবেই বা কী করে! হাদীছ ছাড়া কি কুরআন বুঝা সম্ভব? এদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক পূর্বেই সতর্ক করে বলেছেন, 'জেনে রাখ! আমাকে কুরআন এবং তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে। জেনে রাখ! এমন এক সময় আসবে যখন কোন প্রাচুর্যবান ব্যক্তি তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই আঁকড়ে ধর, তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল হিসাবে এবং যা হারাম পাবে তাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। নবী (ﷺ) বলেন, জেনে রাখ! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেদন দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশুও নয়'।[৫]

আহলে কুরআন বা হাদীছ অস্বীকারকারীদের বিধান

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত মতানুযায়ী আহলে কুরআন বা হাদীছ অস্বীকারকারীরা কাফির। নিম্নে কয়েকজন বিদ্বানের মতামত উল্লেখ করা হল :

(১) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হাদীছ অস্বীকারকারীদের ধ্বংস অনিবার্য'।[৬]

(২) ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাহ্ওয়াইহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোন একটি ছহীহ হাদীছ পৌঁছেছে, অতঃপর সে কোন ভয়ের আশঙ্কা ছাড়াই তাকে অস্বীকার করেছে, তবে সে নিশ্চিতরূপে কাফির'।[৭]

(৩) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যারা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করা অপরিহার্য নয়, তারা কাফির, তাদের হত্যা করা অপরিহার্য'।[৮]

(৪) ইমাম সূয়ূত্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যারা নবী (ﷺ)-এর হাদীছকে অস্বীকার করে তারা কাফির এবং তারা ইসলামের গণ্ডি ও চৌহদ্দি থেকে নিষ্কাষিত হয়ে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অন্য কোন বিধর্মী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে'।[৯]

(৫) ইমাম ইবনু দাক্বীক্ব আল-ঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার পরেও যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারা স্পষ্ট কাফির’।[১০]

(৬) ইমাম ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমরা শুধু কুরআনের বিধানই মানব, হাদীছ মানব না, তবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির’।[১১]

(৭) শায়খ আবূ বাকর আল-আজুর্রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আলিমগণ বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনের মধ্যে যে সমস্ত বিধানকে ফরয করেছেন, তার পদ্ধতি ও নিয়ম-কানূন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত ছাড়া উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর যারা এর বিপরীত বলবে, অর্থাৎ যারা বলবে যে, সুন্নাত ছাড়াও ইসলাম মানা সম্ভব তারা কাফির। তারা ইসলামী দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে’।[১২]

(৮) শায়খ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করে তারা কাফির ও স্বধর্মত্যাগী। কেননা সুন্নাতকে অস্বীকার করা কুরআনকে অস্বীকার করার নামান্তর। যে কিতাব ও সুন্নাতকে অথবা এর কোন একটিকে অস্বীকার করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। অবশ্যই তাকে এ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা দরকার’।[১৩]

(৯) সঊদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি বলেন, ‘যারা সুন্নাত অনুযায়ী আমাল করাকে অস্বীকার করে তারা কাফির’।[১৪]

উপরিউক্ত মতামতের পক্ষের দলীল বর্ণনায় নিম্নে দু’টি হাদীছ উল্লেখ করা হল : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي ‘সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি ঔদাসীন্য ও বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়’।[১৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى الله ‘যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা‘আলারই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ তা‘আলারই নাফরমানী করল’।[১৬]

আল-কুরআনুল কারীমকে আমরা যেমন আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করি, অনুরূপভাবে হাদীছের ক্ষেত্রে আমাদের আক্বীদা কেমন হতে হবে?

এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘কুরআনের মত হাদীছও অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, হাদীছকে কুরআনের মত তেলাওয়াত করা হয় না’।[১৭] খাত্বীব আল-বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ), হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) ও শায়খ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, ‘আল্লাহর আদেশে যেভাবে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবী (ﷺ)-এর নিকট কুরআন নিয়ে অবতরণ করতেন, ঠিক একই রকম ভাবে তাঁর উপর সুন্নাত নিয়েও অবতরণ করতেন’।[১৮] দলীলগুলো নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়’ (সূরা আন-নাজম : ৩-৪)।

২. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওযূ করার সময় হাতে এক অঞ্জলি পানি নিতেন। অতঃপর ঐ পানি থুতনির নিচে প্রবেশ করাতেন এবং তার দ্বারা নিজের দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَ ‘আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এরূপ করারই নির্দেশ দিয়েছেন’।[১৯]

৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, أَلَا إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَه ‘জেনে রাখ! আমাকে কুরআন এবং তার সঙ্গে সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছু দেয়া হয়েছে’।[২০] ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিছ বলেন, ‘সমতুল্য জিনিস’ বলতে হাদীছকেই বুঝানো হয়েছে।[২১]

৪. আবূ মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করে ছালাত আদায় করলেন এবং রাসূল (ﷺ)ও ছালাত আদায় করলেন। আবার তিনি ছালাত আদায় করলেন। রাসূল (ﷺ)ও ছালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি ছালাত আদায় করলেন এবং রাসূল (ﷺ)ও ছালাত আদায় করলেন। আবার তিনি ছালাত আদায় করলেন এবং রাসূল (ﷺ)ও ছালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি ছালাত আদায় করলেন এবং রাসূল (ﷺ)ও ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, ‘আমি এভাবে ছালাত শিখাতে আদিষ্ট হয়েছি’।[২২] উক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সুন্নাত শিখানোর জন্যই অবতরণ করেছিলেন। অতএব বুঝা গেল যে, সুন্নাত বা হাদীছও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী।

৫. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, مَا أُوْتِيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوْهُ إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْت ‘আমি আমার ইচ্ছা মত তোমাদেরকে কোন জিনিস দিই না এবং আমার ইচ্ছা মত তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে বঞ্চিতও করি না। আমি তো কেবল কোষাধ্যক্ষ বা বণ্টনকারী। আমাকে যেখানে ব্যয়ের নির্দেশ দেয়া হয় সেখানেই ব্যয় করি’।[২৩] উক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা‘আলার আদেশ মুতাবিক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনরূপ কমবেশি ছাড়াই বণ্টন করতেন। অতএব প্রমাণিত হল যে, হাদীছও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী।[২৪]

৬. আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَ اَنۡزَلَ اللّٰہُ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ عَلَّمَکَ مَا لَمۡ تَکُنۡ تَعۡلَمُ ؕ وَ کَانَ فَضۡلُ اللّٰہِ عَلَیۡکَ عَظِیۡمًا

‘আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না, তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর আপনার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে’ (সূরা আন-নিসা : **১১৩**)। অন্যত্র তিনি বলেছেন,

لَقَدۡ مَنَّ اللّٰہُ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِیۡہِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِہِمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتِہٖ وَ یُزَکِّیۡہِمۡ وَ یُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ ۚ وَ اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ

‘আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল’ (সূরা আলে ‘ইমরান : ১৬৪)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আমি কুরআনুল কারীমের অগণিত বিশেষজ্ঞের নিকটে শুনেছি, তাঁরা বলেছেন, ‘এখানে ‘কিতাব’ বলতে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে আর ‘হিকমাত’ বলতে রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে’।[২৫]

আহলে কুরআন বা হাদীছ অস্বীকারকারীদের কিছু বিভ্রান্তিমূলক সংশয় ও তার নিরসন

আহলে কুরআন বা হাদীছ বিরোধীদের বিভ্রান্তিকর হাতিয়ারের নাম হল, অনৈতিক যুক্তি। তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ মানুষকে আদর্শচ্যুত করার জন্য তাদের সামনে কিছু

উদ্ভট প্রশ্ন ও নীতিহীন যুক্তি পেশ করে থাকে। নিম্নে তাদের কিছু বিভ্রান্তিমূলক সংশয় ও তার মোক্ষম জবাব উপস্থাপন করা হল :

প্রথম সংশয়

তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কিতাব-ই যথেষ্ট। কেননা কুরআনের মধ্যেই সবকিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনকে বুঝার জন্য অথবা শরী'আতের কোন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুন্নাত বা হাদীছের প্রয়োজন নেই।[১]

নিরসন

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কুরআনে মূলত শরী'আতের মূল নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু নীতিমালা বা বিধি-বিধানের নিয়মনীতি, পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, আকার-আকৃতি, ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি। যদি তাই হয় তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের রাক'আত সংখ্যা, উট, গরু, ছাগল, স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নিসাব বা পরিমাণ, ছিয়ামের বিধি-বিধান, হজ্জের নিয়ম-কানুন ইত্যাদি কোথায় বলা হয়েছে? যদি রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত না থাকত, তাহলে আমরা এগুলো কোথায় থেকে জানতে পারতাম। সেই জন্যই ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত-ই হল, আল্লাহ তা'আলার কিতাবের ব্যাখ্যাকারী'।[২] আল্লামা বাদরুদ্দীন আল-যারকাশী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় রিসালাতের 'রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করা অপরিহার্য' নামক

অনুচ্ছেদে বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল’ (সূরা আন-নিসা : ৮০)। এমন প্রত্যেকটি বিষয় যা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কিতাবে ফরয করেছেন যেমন : ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি। যদি রাসূল (ﷺ) এগুলোর নিয়মনীতি, পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, আকার-আকৃতি, ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত না করতেন, তাহলে আমরা সেগুলো কিভাবে আদায় বা পালন করতাম? তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীত আমাদের পক্ষে কোন ইবাদতই করা সম্ভবপর হত না’।[৩]

‘ইসলাম ওয়েব’-এর আলিমগণ বলেন, ‘অসংখ্য আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূল (ﷺ) ছিলেন কুরআনুল কারীমের উত্তম ব্যাখ্যাকারী। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

‘আর আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে’ (সূরা আন-নাহল : ৪৪)। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

‘আমি তো আপনার প্রতি কিতাব এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে, তাদেরকে আপনি তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ’ (সূরা আন-নাহল : ৬৪)। তিনি আরো বলেন, ‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর’ (সূরা আল-হাশর : ৭)।

আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও’ (সূরা আল-মায়িদাহ : ৩৮)। এখানে সাধারণভাবে চুরি করলেই চোরের হাত কাটার কথা বলা হয়েছে। জাহিরিয়্যাহ্ মাযহাবের ফকীহবিদদের মতানুযায়ী চুরির এই বিধান সকল প্রকার চুরির জন্য ব্যাপক, চুরির পরিমাণ অল্প হোক অথবা বেশি, সুরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করা হোক অথবা অরক্ষিত জায়গা থেকে, সর্বাবস্থাতেই চোরের হাত কাটা যাবে। অথচ বাণীসূচক হাদীছের মধ্যে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) বা ততোধিক চুরি করলে তবেই হাত কাটা যাবে’।[৪]

অতঃপর রাসূল (ﷺ)-এর কর্মসূচক হাদীছ এবং ছাহাবীদের আমল ও স্বীকারোক্তি থেকে তা আরো পরিস্ফুটিত হয়। এরকম শতসহ্র আয়াত আছে, যার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত ছাড়া সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কিছু আয়াত উপস্থাপন করা হল :

(১) আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্ম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত’ (সূরা আল-আন‘আম : ৮২)। ছাহাবীগণ এই আয়াতের ‘যুলম’ শব্দ দ্বারা সাধারণ ছোট-বড় অত্যাচার করা বুঝেছিলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে ছাহাবীগণ চমকে উঠেন এবং ভীতিকর অবস্থায় জিজ্ঞাসা করেন, ‘ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর যুল্ম করেনি? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য ঈমানের সাথে যুল্মকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কী? রাসূল (ﷺ) উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে যুল্ম বলতে শিরকক বুঝানো হয়েছে। দেখ, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

‘নিশ্চিত শিরক বিরাট যুলম’।[৫] কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, অতঃপর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর ইবাদাতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথপ্রাপ্ত।

(২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে, তাহলে ছালাত ক্বছর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ (সূরা আন-নিসা : ১০১)।

উপরিউক্ত আয়াত থেকে আপাতদৃষ্টিতে এটাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, সফরে ক্বছরের ছালাত ভয়-ভীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে জন্যই কিছু ছাহাবায়ে কিরাম রাসূল (ﷺ)-কে বিস্মৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যেমন ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা‘আলা যে বলেছেন, ‘যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফিররা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তবে ছালাত ক্বছর (সংক্ষিপ্ত) করলে এতে তোমাদের কোন দোষ নেই’। আর মানুষ তো এখন নিরাপদে আছে? (অর্থাৎ তাহলে কি নিরাপদ স্থানে ক্বছর করা যাবে না?) জবাবে তিনি বলেন, তুমি যে বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ, আমিও সে বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। তাই আমিও এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘ওটা তো একটি ছাদাক্বাহ্ বিশেষ, যা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের দান করেছেন। কাজেই তোমরা তাঁর ছাদাক্বাহ্ গ্রহণ কর’।[৬]

(৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত’ (সূরা আল-মায়িদাহ : ৩)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত মাছের বিধান কী হবে? কলিজার বিধান কী হবে? খাওয়া যাবে কী-না?! রাসূল (ﷺ)-এর বাণীসূচক হাদীছের আলোকে প্রমাণিত

হয় যে, প্রাণীর মধ্যে সমস্ত প্রকারের মৃত মাছ ও মৃত টিড্ডি খাওয়া হালাল, আর রক্তের মধ্যে কলিজা বা লিভার ও প্লীহা খাওয়া হালাল। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমাদের জন্য দু’প্রকারের মৃতজীব ও দু’ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু’টি হল, মাছ ও টিড্ডি, এবং দু’প্রকারের রক্ত হল, কলিজা ও প্লীহা’।[৭] এক্ষেত্রে কিন্তু কেউ কোন দ্বিমত পোষণ করে না, এমনকি যারা নিজেকে আহলে কুরআন বলে দাবী করে তারাও না। তারাও নবী (ﷺ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মজা করে মৃত মাছ ও কলিজা ভক্ষণ করছে।

(৪) আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘(হে নবী!) আপনি বলুন, আমার প্রতি যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে আহারকারী যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত, কেননা তা অপবিত্র। অথবা যবহকালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়ার কারণে যা অবৈধ’ (সূরা আল-আন‘আম : ১৪৫)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কুকুরের বিধান কী হবে? সাপের বিধান কী হবে? ইঁদুরের বিধান কী হবে? শকুনের বিধান কী হবে? খাওয়া যাবে কি-না?!

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতের সুবিধার্থে উক্ত আয়াতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পেশ করেন। তিনি একটি উছূল বা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ﷺ) খায়বার যুদ্ধের দিন শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিং¯্র জন্তু এবং নখযুক্ত যে কোন শিকারী পাখী আহার করতে নিষেধ করেছেন।[৮]

দ্বিতীয় সংশয়

তারা মনে করে যে, হাদীছ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী নয়, বরং এগুলো তো কথা মাত্র যা আল্লাহর নামে মিথ্যা চালানো হচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ)।[৯]

নিরসন

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ) এবং সুন্নাতের স্থান স্পষ্ট করে বলেন,

وَ لَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ الۡاَقَاوِيۡلِ- لَاَخَذۡنَا مِنۡهُ بِالۡيَمِيۡنِ- ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ الۡوَتِيۡنَ - فَمَا مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ عَنۡهُ حٰجِزِيۡنَ

'যদি তিনি আমার নামে কিছু রচনা করে চালানোর চেষ্টা করতেন। তবে অবশ্যই আমি তাঁকে ডান হাত দ্বারা পাকড়াও করতাম এবং তাঁর জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাঁকে রক্ষা করতে পারত' (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৭)। উক্ত আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, যদি রাসূল (ﷺ) নিজের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়ে বলার চেষ্টা করতেন অথবা এতে কম-বেশি করতেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পাকড়াও করতেন এবং তাঁকে ঢিল দিতেন না। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য রাসূল ছিলেন। যেহেতু তাঁকে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেননি তার মানে এই যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বানিয়ে বলেননি।

পক্ষান্তরে হাদীছের প্রামাণিকতায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না। তা তো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়' (সূরা আন-নাজম : ৩-৪)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ আয়াত প্রমাণ করে যে, কুরআনের মত সুন্নাতও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী।[১০]

সাইয়িদ রশীদ রেযা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হাদীছে বর্ণিত বিধানগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী। অহী শুধু কুরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়'।[১১]

দলীল হল আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওযূ করার সময় হাতে এক অঞ্জলি পানি নিতেন। অতঃপর ঐ পানি থুতনির নিচে প্রবেশ করাতেন এবং তার দ্বারা নিজের দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ 'আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এরূপ করারই নির্দেশ দিয়েছেন'।[১২]

উপরিউক্ত বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে হাদীছের মধ্যে, অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমাকে আমার প্রতিপালক এমনই করতে বলেছেন। তার মানে বুঝা যাচ্ছে হাদীছও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী। তবে হ্যাঁ, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন,

ক. আল-কুরআন অহী মাতলু আর হাদীছ অহীয়ে গায়রে মাতলু।

খ. আল-কুরআন মু'জিযাসমূহের মধ্যে একটি, কিন্তু হাদীছ তা নয়।

গ. আল-কুরআনের শব্দ ও অর্থ দু'টিই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে নাযিলকৃত। পক্ষান্তরে হাদীছের অর্থ আল্লাহর কিন্তু শব্দ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর।

ঘ. আল-কুরআন ইসলামী শরী'আতের প্রথম উৎস, আর ছহীহ হাদীছ ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস।

ঙ. আল-কুরআন ছালাতের মধ্যে তেলাওয়াত করা হয়, কিন্তু হাদীছ ছালাতে তেলাওয়াত করা হয় না।

চ. আল-কুরআন তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরে দশ-দশ ছাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু হাদীছ পাঠে কোন নির্ধারিত ছাওয়াব পাওয়া যায় না।

ছ. আল-কুরআন তেলাওয়াতের জন্য পবিত্রতা একটি প্রাথমিক শর্ত, কিন্তু হাদীছ পাঠের জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।[১৩]

তৃতীয় সংশয়

এই নির্বোধেরা বলে থাকে যে, রাসূল (ﷺ)-এর আদেশ মানা যাবে না, কেননা এটি শিরক। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ‘হুকুম কেবল আল্লাহর কাছেই’ (সূরা আল-আন‘আম : ৫৭)। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ মান্য করা যাবে না।[১৪]

নিরসন

এ কথা ঠিক যে আদেশ কেবল আল্লাহ তা‘আলারই মানতে হবে। কিন্তু সেই আল্লাহ তা‘আলাই তো রাসূল (ﷺ)-এর আদেশ মানার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

‘কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের অন্তরে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়’ (সূরা আন-নিসা : ৬৫)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নিজের সত্তার শপথ করে বলেন, রাসূল (ﷺ)-এর আদেশ মেনে না নেয়া পর্যন্ত কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না।

অতএব প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ মানাটাই হল আল্লাহর আদেশ মানা।[১৫] অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যখন মুমিনদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর ওরাই হল সফলকাম’ (সূরা আন-নূর : ৫১)। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধান মানা যাবে না’ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এই বিধানের গ-ির বাইরে রাখা হয়েছে। বরং এটি রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, َمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল’ (সূরা আন-নিসা : ৮০)।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে ইসলামী আইন প্রণয়নে এবং কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার ক্ষেত্রে সুন্নাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা সূর্যালোকের ন্যায় পরিস্ফুটিত হয়। যদি আমরা উপরিউক্ত উদাহরণগুলো এবং সেই সাথে সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে যেগুলোকে আমরা এখানে উল্লেখ করিনি সেগুলোকেও একটু গভীরভাবে বিবেচনা করি, তাহলেই আমরা নিশ্চিত

হয়ে যাব যে, সুন্নাতের সাহায্য ছাড়া কুরআনুল কারীমকে পূর্নাঙ্গরূপে বুঝার এবং তার উপর আমল করার কোন উপায় নেয়।[১৬] আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সালাফে ছালিহীনের মানহাজ অনুযায়ী কুরআনুল কারীমকে বুঝার ও মানার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

-*হাসিবুর রহমান বুখারী*

মাসিক আল ইখলাস

তথ্যসূত্র :

[১]. মাজাল্লাহ্, ইশা'আতুল কুরআন, পৃ. ৪৯, ৩য় সংখ্যা, ১৯০২ খ্রি. ইশা'আতুস সুন্নাহ, ১৯তম খ-, পৃ. ২৮৬, ১৯০২ খ্রি.; বুরহানুল ফুরক্বান, পৃ. ৪।

[২]. রিসালাতুশ শাফিঈ, ১ম খ-, পৃ. ৭৯; ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব, ফৎওয়া নং-৯৩১১১।

[৩]. আল-বাহরুল মুহীত্ব, ৬ষ্ঠ খ-, পৃ. ৭-৮।

[৪]. ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৯, ৬৭৯০, ৬৭৯১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৪, নাসাঈ, হা/৪৯৪৩।

[৫]. সূরা লুক্বমান : ১৩; ছহীহ বুখারী, হা/৩২, ৩৩৬০, ৩৪২৮, ৩৪২৯, ৪৬২৯, ৪৭৭৬, ৬৯১৮, ৬৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৪; তিরমিযী, হা/৩০৬৭।

[৬]. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৬; তিরমিযী, হা/৩০৩৪; নাসাঈ, হা/১৪৩৩; আবূ দাউদ, হা/১১৯৯; ইবনু মাজাহ, হা/১০৬৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৫, ২৪৬।

[৭]. ইবনু মাজাহ, হা/৩৩১৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৭২৪; ছহীহুল জামি', হা/২১০; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১১১৮।

[৮]. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫২৭, ৫৫৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৩২-১৯৩৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩২৩৪; নাসাঈ, হা/৪৩৪৮; আবূ দাঊদ, হা/৩৮০৩, ৩৮০৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/ ২১৯৩, ২৭৪২, ৩০১৫, ৩০৬০, ৩১৩১, ৩৫৩৪; ইরওয়াউল গালীল, হা/২৪৮৮।

[৯]. আল-মুবাহাছাহ, পৃ. ৮১; ইশা'আতুস সুন্নাহ, ১৯তম খ-, পৃ. ২৯১; মাজাল্লাহ্, ইশা'আতুল কুরআন, পৃ. ৩৫; চতুর্থ সংখ্যা, ১৯০৩ খ্রি.।

[১০]. তাফসীরে কুরতুবী, ৭ম খ-, পৃ. ২৬৫৫।

[১১]. তাফসীরুল মানার, ৮ম খ-, পৃ. ৩০৮।

[১২]. আবূ দাঊদ, হা/১৪৫; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ১ম খ-, পৃ. ৫৪; হাকিম, ১ম খ-, পৃ. ১৪৯; ইরওয়াউল গালীল, ১ম খ-, পৃ. ১৩০।

[১৩]. ক্বাওয়াঈদুত তাহদীছ, পৃ. ৬৪; উছূলুল হাদীছ, পৃ. ২৯; ইসলাম ওয়েব, ফৎওয়া নং- ৬৮৮০৫, ৭২৭৯৮; আল-কুরআনিয়্যীন, ১ম খ-, পৃ. ২১৫-২১৭।

[১৪]. আল-মুবাহাছাহ, পৃ. ৪২।

[১৫]. আল-কুরআনিয়্যীন, ১ম খ-, পৃ. ২২০।

[১৬]. মানযিলাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ৪-১২।